বাসর

হুমায়ূন আহমেদ

দ্বিতীয় অন্যপ্রকাশ সংস্করণ	ডিসেম্বর ২০০২
প্রথম অন্যপ্রকাশ সংস্করণ	জুলাই ২০০২

©	লেখক

প্রচ্ছদ	মাসুম রহমান
কম্পিউটার গ্রাফিক্স	লিটিল এম
প্রকাশক	মাজহারুল ইসলাম অন্যপ্রকাশ ৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন : ৭১২৫৮০২ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৬৬৪৬৮১
মুদ্রণ	কালারলাইন প্রিন্টার্স ৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা
মূল্য	৫৫ টাকা
উত্তর আমেরিকা পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাজ্য পরিবেশক	সঙ্গীতা লিমিটেড ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য
Bashor	By Humayun Ahmed Published by Mazharul Islam, Anyaprokash Cover Design : Masum Rahman Price : Tk. 55 only ISBN : 984 868 203 1

উৎসর্গ

স্নিগ্ধা করিম

আমার উৎসর্গপত্রগুলি সে খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ে। আমি না-কি উৎসর্গপত্রে অনেক মজা করি। তার ধারণা কোনো একদিন তাকে একটি বই আমি উৎসর্গ করব। সেখানে অনেক মজার কথা থাকবে। বই উৎসর্গ করা হলো।

অন্যপ্রকাশ
প্রকাশিত
লেখকের অন্যান্য বই

আসমানীরা তিন বোন
দ্বিতীয় মানব
আজ আমি কোথাও যাব না
চলে যায় বসন্তের দিন
নীল মানুষ
কুটু মিয়া
মৃন্ময়ী
তেতুল বনে জোছনা
আমিই মিসির আলি
বৃষ্টি বিলাস
শুভ্র
রূপার পালঙ্ক
অচিনপুর
জোছনাত্রয়ী
হুমায়ূন আহমেদ-এর হাতে পাঁচটি নীলপদ্ম
নির্বাচিত গল্প
অদ্ভুত সব উপন্যাস
ভূত সমগ্র
নির্বাচিত কিশোর উপন্যাস
কানী ডাইনি
নির্বাচিত হিমু
'৭০ দশকের নির্বাচিত পাঁচটি উপন্যাস
'৮০ দশকের নির্বাচিত পাঁচটি উপন্যাস
'৯০ দশকের নির্বাচিত পাঁচটি উপন্যাস

এখানে কিছু রহস্য আছে।

অতীন্দ্রিয় রহস্য! মাঝে-মাঝে কড়া ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। এমন কড়া যে, গা ঝিম-ঝিম করে। মাথা ধরে যায়।

জায়গাটা হচ্ছে রিং রোডের মাঝামাঝি— শ্যামলী থেকে আদাবরের দিকে যাবার ইট-বিছানো রাস্তা। আশেপাশে কোনো ফুলের গাছ নেই যে, ফুলের গন্ধ আসবে। তাছাড়া ফুলের গন্ধে গা ঝিম-ঝিম করে না। নিশ্চয়ই অন্য কোনো ব্যাপার। কোনো জটিল রহস্য।

আহসান আজ আবার গন্ধটা পাচ্ছে। গতকাল ছিল না, তার আগের দিনও ছিল না। ব্যাপারটা কী ? রাত প্রায় এগারটা। আহসান চিন্তিত মুখে সিগারেট ধরাল। এরকম নির্জন রাস্তায় এত রাতে সিগারেট ধরিয়ে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। আশেপাশে খুব ছিনতাই হচ্ছে। দাড়ি-গোঁফ এখনো গজায় নি এমন সব ছেলেপুলেরা পেনসিল-কাঁটা ছুরি দেখিয়ে মানিব্যাগ নিয়ে যাচ্ছে। এরকম সময়ে গন্ধ-রহস্য ভেদ করার জন্যে মাঝরাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার কোনো অর্থ হয় না।

আশ্চর্য, গন্ধটা হঠাৎ মিলিয়ে গেল। এই রহস্যের কোনো মানে হয় ? এটা নিয়ে কারো সঙ্গে আলাপ করলে হয়। কিন্তু এই ব্যাপারটা আদাবরের রাস্তায় পা না-দেয়া পর্যন্ত মনে আসে না। যখন মনে আসে তখন আশেপাশে কেউ থাকে না যার সঙ্গে আলোচনা করা যায়।

আদাবরের দিক থেকে পাঁচ-টনি ট্রাক আসছে। রাস্তায় লোকজন নেই বলেই ট্রাক আসছে ঢিমাতেতালা গতিতে। লোকজন থাকলে ঝড়ের গতিতে চলে আসত। আহসান একপাশে সরে দাঁড়াল। হেড-লাইটের আলোয় তার চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। তাকানো যাচ্ছে না, আবার চোখ ফিরিয়েও নেওয়া যাচ্ছে না। কড়া আলোর একধরনের সম্মোহনী শক্তি আছে। শুধু পতঙ্গ না— এই আলো মানুষকেও আকৃষ্ট করে।

ট্রাকটা আহসানের ঠিক গায়ের উপর এসে আচমকা ব্রেক কষল। ড্রাইভার দরজা খুলে অর্ধেকটা শরীর বের করে তাকে হাত ইশারা করে ডাকছে। ড্রাইভার বা দারোয়ান শ্রেণীর কেউ হাত ইশারা করে ডাকলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তবে এই ড্রাইভার আহসানের চেনা। তার বাড়িওয়ালা করিম সাহেবের ড্রাইভার। বাড়িওয়ালার বাড়ির একতলায় থাকে। নাম— নাজিম, নিজাম কিংবা এই ধরনের কিছু। আহসানের সঙ্গে দেখা হলে লাল চোখে তাকায় এবং পান খাওয়া হলুদ দাঁত বের করে হাসে। আবার মাঝে-মাঝে না-চেনার ভঙ্গি করে।

প্রবেসার সাব, খবর হুনছেন ?

না। কী খবর ?

করিম সাবের কথা কিছু হুনছেন ?

না।

যায়-যায় অবস্থা। অক্সিজেন চলতাছে...

কী হয়েছে ?

এক্সিডেন— টেম্পোর লগে ধাক্কা— মাথা গুঁড়া। খুবই আফসোসের কথা, কি কন প্রবেসার সাব ?

আহসান কিছু বলল না। ফুলের গন্ধটা আবার পাওয়া যাচ্ছে। পেট্রোল এবং ধোঁয়ার গন্ধ ছাপিয়ে মিষ্টি একটা গন্ধ। এর মানেটা কী ? রহস্যটা কোথায় ?

আরিচা থনে টিরিপ আইন্যা খবর হুনলাম। মিজাজ ঠিক নাই আমার— বুঝছেন প্রবেসার সাব। দেখবার যাইতাছি।

ড্রাইভার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। গিয়ার বদলাতে-বদলাতে বলল, এর নাম হালার দুনিয়া। আজিব জায়গা। প্রবেসার সাব, যাই।

এবার ট্রাক ছুটছে ঝড়ের মতো। আহসানের মনে হলো একটা ভুল হয়ে গেছে— তার উচিত ছিল ড্রাইভারের সঙ্গে যাওয়া। ব্যাপারটা মনেও হয় নি। ফুলের গন্ধ সব এলোমেলো করে দিয়েছে।

করিম সাহেব লোকটিকে সে পছন্দ করে। বেঁটেখাট মানুষ। মুখভর্তি পান। হাসিখুশি। পাশ দিয়ে গেলে জরদার চমৎকার গন্ধ পাওয়া যায়। ভদ্রলোক এমন ভঙ্গিতে পান খান যে, মনে হয় স্বর্গীয় কোনো খাদ্য চিবুচ্ছেন। তাঁকে দেখলেই পান খেতে ইচ্ছা করে।

বাড়িওয়ালারা প্রায়ই বেশ নামাজি হয়— ইনিও তাই। তাঁর গায়ে সব সময় পরিষ্কার ঝকঝকে একটা পাঞ্জাবি থাকে। মাথায় তার চেয়েও পরিষ্কার একটা টুপি। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। বেশ নাদুস-নুদুস। দেখলেই মনে হয়, খুব

শিগগিরই এঁর হার্ট অ্যাটাক বা মাইল্ড স্ট্রোক জাতীয় কিছু হবে। কিন্তু হয় না। তাঁর তিনজন ভাড়াটে আছে। যাদের সবার সঙ্গেই তাঁর সুসম্পর্ক। দু'জন ভাড়াটে তাঁকে চাচা ডাকে। আহসান তাঁকে কিছুই ডাকে না; তবে তিনি আকার-ইঙ্গিতে প্রায়ই বুঝিয়ে দেন যে, আহসানকে তিনি নিজের ছেলের মতো দেখেন।

ভদ্রলোকের পাঁচ মেয়ে, কোনো ছেলে নেই। বড় তিনটি মেয়ে স্কুলে-কলেজে কোথাও যায় না। সম্ভবত বিয়ের জন্যে অপেক্ষা করে। ছোট দু'টি স্কুলে যায়। আহসানের সঙ্গে দেখা হলে এই দুই স্কুল-যাত্রী মৌলানাদের মতো টেনে-টেনে বলে, আসসালামু আলায়কুম। আহসান তার উত্তরে সব সময় বলে, কী, খবর ভালো ?

এই প্রশ্নের উত্তর এরা দেয় না। গম্ভীর হয়ে থাকে। হাসেও না। মনে হয় খানিকটা বিরক্ত হয়।

করিম সাহেব মাঝেমধ্যে তাকে খেতে ডাকেন। অন্য ভাড়াটেদের ডাকেন না। সে একা-একা থাকে, এই কারণেই হয়তো; কিংবা কে জানে— হয়তো তাঁর কোনো পরিকল্পনা আছে। যাঁর বড়-বড় তিনটি মেয়ে বিয়ের জন্যে অপেক্ষা করছে তাঁর পরিকল্পনা থাকা অন্যায় নয়। অবশ্যি তিনি এখন পর্যন্ত ইশারা বা ইঙ্গিতে এ বিষয়ে কিছু বলেন নি। মেয়েদের প্রসঙ্গে তিনি যা বলেন তার সারমর্ম হচ্ছে— মেয়েগুলো মহা অপদার্থ। সংসারের কিছু জানে না, কিছু বোঝে না। দিনরাত ঝগড়া করে আর টাকা জমায়।

আহসান অবাক হয়ে বলেছিল, টাকা জমায় মানে ?

জমায় মানে জমায়— সঞ্চয়।

পায় কোথায় টাকা ? আপনি দেন ?

পাগল, আমি দিব কেন ? ওরা চুরি করে। মা'র কাছ থেকে চুরি করে, মাঝে-মাঝে আমার পকেটে হাত দেয়; মহা হারামি। আগে চড়-থাপ্পড় দিতাম, এখন বড় হয়ে গেছে, চড়-থাপ্পড় দিতে পারি না। যখন মেজাজ ঠিক থাকে না— দিই। তখন তাদের মা কান্দে। এরা হইল কান্দন পার্টি। মা কান্দে, মেয়ে কান্দে। একবার কী হইল শুনেন— প্রাইভেট মাস্টার আসছে। বড় মেয়েটাকে পড়াইতাছে, হঠাৎ কারেন্ট নাই। মাস্টার হারামজাদা সুযোগ বুইঝা গায়ে হাত দিছে। বুঝেন অবস্থা। মেয়ে কোনো শব্দ করে না— ফিঁচ-ফিঁচ কইরা কান্দে। বুঝেন অবস্থা। মা যেমন বোকা, আমার মেয়েগুলিও হইছে বোকা। বাজারের সেরা বোকা।

কোনো বাবা নিজের মেয়েদের নিয়ে এ জাতীয় কথা বলতে পারে তা আহসানের ধারণার বাইরে ছিল। এই লোক বলে।

ভদ্রলোকের কথাবার্তার ভঙ্গি থেকে আহসানের মাঝে-মাঝে মনে হয় তাকে নিয়ে ভদ্রলোকের তেমন কোনো পরিকল্পনা নেই। থাকলে মেয়েদের সম্পর্কে এ জাতীয় কথাবার্তা বলতেন না। তাছাড়া খেতে যখন ডাকেন তখনো মেয়েরা কেউ আসে না বা উঁকি-ঝুঁকি দেয় না। তাঁর বাড়ির পর্দা প্রথাটি বেশ কঠিন। মেয়েগুলো নিউমার্কেটে যায় বোরকা পরে।

আহসানের বাসা তিনতলার ডান-দিকে। বাঁ-দিকটা খালি। দরজা-জানালা এখনো লাগানো হয় নি। আহসানের বাসাও পুরোপুরি তৈরি হয় নি। চুনকাম বাকি আছে। দরজায় রঙ লাগানো হয় নি। তিনটি রুমের একটিতে এখনো দরজা-জানালা লাগানো বাকি। সে-কারণেই ভাড়া কম— তের শ' টাকা। গ্যাস-ইলেকট্রিসিটি সবই এর মধ্যে। তবে গ্যাস লাইন এখনো বসে নি বলে এই সুবিধাটি পাওয়া যাচ্ছে না। ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে— সুযোগ পেলেই করিম সাহেব এই কথা শুনিয়ে দেন— কয়েকটা দিন অপেক্ষা করেন। গ্যাস লাইন বসলে কত আরাম হবে দেখেন। এক পয়সা বাড়ি ভাড়া বাড়াব না। ভদ্রলোকের এক জবান। এত সস্তায় ঢাকা শহরে আর বাড়ি নাই। কী রকম আলো-হাওয়া, দেখতেছেন ? ভাদ্র মাসেও ফ্যান ছাড়তে হয় না। দক্ষিণমুখী বাড়ি।

বাড়ি দক্ষিণমুখী খুবই ঠিক কথা। আলো-হাওয়াও প্রচুর— অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে তিনতলায় যেতে হয় বাড়িওয়ালার ঘরের ভেতর দিয়ে। বাইরে সিঁড়ি নেই। ভাড়া দেওয়ার জন্যে যে বাড়ি বানায় সে কখনো এমন অদ্ভুত ব্যবস্থা রাখে ? কিন্তু করিম সাহেব রেখেছেন। এবং তাঁর কথায় মনে হয় তিনি এটা রেখেছেন ইচ্ছা করেই।

বাইরে সিঁড়ি থাকলে চুরি-চামারির সুবিধা। হুট করে চেনা-অচেনা লোক ঢুকে পড়বে। এখন সেটা পারবে না। সব থাকবে চোখে-চোখে। রাতের বেলা কলাপসেবল গেট বন্ধ করলে একেবারে নিশ্চিন্ত। দরজা-জানালা খোলা রেখে নাক ডাকিয়ে ঘুমান। কোনো অসুবিধা নাই।

আসতে-যেতে বারবার বিরক্ত করতে হয় আপনাদের।

বিরক্ত করতে হলে করবেন। পয়সা দিচ্ছেন, বিরক্ত করবেন না ? মাগনা থাকলে একটা কথা ছিল। আর পরের বাড়ি মনে করেন কেন ? নিজের বাড়ি মনে করবেন। একদম নিজের বাড়ি।

করিম সাহেবের এই বাড়িটিকে নিজের বাড়ি মনে করার কোনোই কারণ আহসানের ঘটে নি। এই পরিবারের অন্য কারোর সঙ্গে তার সামান্যতম পরিচয়ও নেই। তাঁর স্ত্রীকে সে এখনো চোখে দেখে নি। অথচ সে দু'মাসের উপর এ-বাড়িতে আছে। তাঁর বড় তিনটি মেয়ের সঙ্গে হঠাৎ-হঠাৎ দেখা হয়ে

যায়, তবে তখন তারা এমন চমকে উঠে যে আহসানের নিজেরই অস্বস্তি লাগে। মেয়ে তিনটি দেখা হলেই বিদ্যুতের মতো মাথা ঘুরিয়ে নেয়। মহা বিরক্তিকর ব্যাপার। ছোট দু'টি এরকম না করলেও রোবটের মতো গলায় বলে— আসসালামু আলায়কুম। সেটা আরো বিরক্তিকর। সালাম দেওয়ার অদ্ভুত কায়দা তারা কোথায় শিখেছে কে জানে!

করিম সাহেবের বারান্দায় আজ বাতি জ্বলছে। বারান্দায় সাত-আটটি চেয়ার পাতা। তাঁর বড় মেয়েটি ছোট দু'টি বোনকে নিয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে। আহসানকে দেখে এরা তিনজনই উঠে দাঁড়াল। যেন তারা আহসানের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। এই প্রথমবার ছোট মেয়ে দু'টি 'আসসালামু আলায়কুম' বলল না। বড় মেয়েটিও মাথা ঘুরিয়ে মূর্তির মতো হয়ে গেল না। আহসান কী করবে ভেবে পেল না। দাঁড়াবে খানিকক্ষণ ? করিম সাহেবের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেবে নাকি সরাসরি সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাবে উপরে ? সে সবচেয়ে ছোট মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার আব্বা এখন কেমন আছেন ?

জানি না।

দেখতে যাও নি ?

সবাই গেছে। আমরা তিনজন শুধু আছি।

তোমরা যাও নি কেন ?

মেয়েটি এই প্রশ্নের জবাব দিল না। তাকাল বড় বোনের দিকে। বড় মেয়েটি বলল, আপনি এখানে একটু বসুন।

মেয়েটির গলার স্বর ঠাণ্ডা এবং কোমল। উচ্চারণ স্পষ্ট। বাবার মতো আঞ্চলিক সুর নেই; যদিও একটু টেনে-টেনে কথা বলছে। তার কথা বলার মধ্যে কোনো জড়তাও নেই। তাকিয়ে আছে সরাসরি আহসানের দিকে। সুন্দর চেহারা। বেশ ফরসা— একটা স্নিগ্ধ ভাব আছে। সম্ভবত অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছে। চোখ-মুখ ফোলা-ফোলা, সেই কারণেই কি একটা আদুরে ভাব চলে এসেছে ? করিম সাহেবের কথা অনুসারে এই মেয়েটিও টাকা চুরি করে এবং নিজের ট্রাংকে গোপনে জমায়। মেয়েটিকে দেখে এটা ভাবতে বেশ কষ্ট হয়।

আমাকে বসতে বলছ ?

জি। আপনি একটু বসুন। আমাদের ভয় লাগছে।

কীসের ভয় ?

বাথরুমে অনেকক্ষণ ধরে কী যেন শব্দ করছে।

ইঁদুর-টিদুর হবে বোধহয়।

জি-না। ইঁদুর না। অন্য কিছু।

অন্য কিছু কী ?

বড় মেয়েটি তার জবাব দিল না। ছোট মেয়ে দু'টি এ ওর দিকে তাকাতে লাগল। এদের কারোর নামই আহসানের জানা নেই। সবার নামই একই ধরনের। পাঁচটি একধরনের নাম মনে রাখা কষ্ট। আহসান বলল, চোর-টোর নাকি ?

বড় মেয়েটি বলল, জি-না, চোর না। সাদা কাপড় পরা একজন কে যেন বাথরুমে ঢুকল। আমি বাথরুমে গিয়ে দেখি কিছু নেই।

ভূত-প্রেত ?

মেয়েটি জবাব দিল না। আহসান বলল, বাবার ব্যাপারে তোমাদের মন দুর্বল হয়ে আছে, তাই এসব দেখেছ। ঢাকা শহরে অনেক কিছুই আছে— ভূত নেই।

আমি এই সাদা কাপড় পরা মেয়েটাকে আগেও একদিন দেখেছি, ছাদে বসেছিল।

বলো কী তুমি!

মেয়ে তিনটি ভূতের ভয়েই মুখ শুকনো করে বসে আছে। বাবার অসুখের চেয়ে এই ভয়টিই বর্তমানে তাদের কাবু করেছে। ঠিক এই মুহূর্তে তারা সম্ভবত বাবার কথা ভাবছে না। আহসান বসল। ঠিক তখন সত্যি-সত্যি খটখট শব্দ শোনা গেল ভেতর থেকে। দারুণ চমকে উঠল মেয়ে তিনটি। আহসান বলল, চল দেখে আসি।

আপনাকে কিছু দেখতে হবে না। আপনি এখানে খানিকক্ষণ বসুন। বেশিক্ষণ বসতে হবে না। জালাল মিয়া চলে আসবে।

জালাল মিয়া কে ?

ট্রাকের ড্রাইভার।

ঠিক আছে আমি বসলাম। এত জায়গা থাকতে ভূতটা বাথরুমে গিয়ে বসে আছে কেন ? এই রাতদুপুরে গোসল করার তার কী দরকার পড়ল ? বোধহয় গরম লাগছে।

একটি সহজ এবং সাধারণ রসিকতা। পরিস্থিতি হালকা করার জন্যে এরকম রসিকতা করা যেতে পারে। কিন্তু বড় মেয়েটি এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন খুব আহত হয়েছে। এই সাধারণ রসিকতাটিতে আহত হবার কী আছে ? আহসান বলল, অন্য ভাড়াটেরা কেউ নেই ?

জি-না।

অন্য ভাড়াটেরা কেউ যে নেই এই তথ্যটি আহসানের জানা। দোতলার বাঁ-দিকের ভাড়াটে আশিক সাহেব তাঁর স্ত্রীকে দেশের বাড়িতে রেখে আসতে গিয়েছেন। ডান-দিকের ভাড়াটে বজলু সাহেব গত সপ্তাহে বাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন। বজলু সাহেবকে আহসানের সব সময় ভালোমানুষ বলে মনে হতো। কিন্তু লোকটি চলে যাবার পর জানা গেল সে বাথরুমের কমোড ভেঙে দু' টুকরা করেছে। একটি আয়না এবং রান্নাঘরের বেসিন ভেঙেছে। শোবার ঘরের জানালার সবক'টি কাচ ভেঙেছে। এই কাজগুলো তাকে বেশ পরিশ্রম করে করতে হয়েছে বলাই বাহুল্য।

করিম সাহেব আহসানকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সব দেখালেন। তার মনে হলো রাগের বদলে ভদ্রলোকের বিস্ময়টাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। বারবার বলছেন, এরকম কেন করল বলেন তো ?

বলা মুশকিল। আপনার উপর হয়তো রাগ আছে।

রাগ থাকবে কেন ? আমাকে সব সময় চাচা-চাচা বলত। যাবার সময় পা ছুঁয়ে সালাম করল। আমি পনের দিনের ভাড়া নিই নাই।

দুনিয়ায় অনেক রকমের মানুষ আছে।

আমাকে ক্ষতি করিয়ে তার লাভ কী হলো ?

ক্ষতি করেছে এইটাই লাভ।

যদি কোনোদিন দেখা হয় আপনার সঙ্গে, তাহলে কথাটা জিজ্ঞেস করবেন। বলবেন— আমি মনে কষ্ট পেয়েছি। খুব কষ্ট।

দেখা হলে বলব। দেখা হবে না। এই জাতীয় লোকদের সঙ্গে দেখা হয় না।

তাও ঠিক। কী সমস্যায় পড়েছি বলেন তো দেখি। বাড়ি ঠিকঠাক না-করে ভাড়াও দিতে পারব না। ইংলিশ কমোড আর বেসিন ছিল। শখ করে কিনেছিলাম। আগে জানলে বাংলাদেশীটা কিনতাম।

আহসান সিগারেট ধরাল। খালি পেটে সিগারেট টানতে ভালো লাগছে না। মুখ বন্ধ করে বারান্দায় বসে থাকাও বিরক্তিকর। বড় মেয়েটি এখন আবার কাঁদতে শুরু করেছে। কাঁদছে নিঃশব্দে। এবং খুব চেষ্টা করছে নিজেকে আড়াল করে রাখতে। ছোট মেয়ে দু'টি বোনের গা ঘেঁসে বসে আছে এবং একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বোনের দিকে। এদের ভাব-ভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছে এরাও কাঁদতে শুরু করবে। আহসানের কারণে সঙ্কোচ বোধ করছে বলে কাঁদছে না।

রাস্তায় ট্রাকের আলো দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত জালাল মিয়া ট্রাক নিয়ে আসছে। মেয়ে তিনটি উঠে দাঁড়িয়েছে। গভীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। বড় মেয়েটি বলল, আপনি এখন যেতে পারেন, জালাল এসেছে।

আহসান নিজের ঘরে চলে এলো। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় মনে হলো— জালাল কী খবর আনল জানা দরকার ছিল। অতি সাধারণ ভদ্রতা। কেন জানি ভদ্রতাটা করা হলো না। মেয়েদের সঙ্গে আলাপে সে করিম সাহেবের প্রসঙ্গ আনে নি। এটাও অন্যায় হয়েছে। খুবই অন্যায়। অ্যাক্সিডেন্ট কীভাবে হলো এইসব জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল।

দরজায় খুট-খুট শব্দে টোকা পড়ছে। আহসান দরজা খুলল, জালাল মিয়া দাঁড়িয়ে আছে।

বিরক্ত করলাম প্রবেসার সাব।

না, বিরক্তের কিছু না। উনার খবর কী ?

খবর খারাপ। মেয়েগুলিরে নিতে আসছি। রাতে আর ফিরব না। আপনারে বলে গেলাম। একটু লক্ষ রাখবেন।

রাখব, লক্ষ রাখব।

যা মুশকিলে পড়লাম ভাইজান— মেয়েগুলি খুব কানতেছে। আচ্ছা যাই। আপনার কাছে সিগারেট আছে ? থাকলে একটা দেন।

প্যাকেটে দু'টি সিগারেট ছিল। আহসান প্যাকেটটাই হাতে তুলে দিল।

বিপদের উপরে বিপদ— বুঝলেন প্রবেসার সাব। আমার হেলপার ব্যাটারে কুত্তায় কামড় দিছে। পনরোখান ইনজিকশন লাগে। কী সমস্যা চিন্তা করেন দেহি।

সিগারেটের প্যাকেটটা দিয়ে দেওয়া ভুল হয়েছে। আহসানের ধারণা ছিল ড্রয়ারে একটা নতুন প্যাকেট আছে, এখন দেখা যাচ্ছে নতুন প্যাকেট নেই। পুরনো চিঠিপত্র, একটা মোমবাতি, এক প্যাকেট নতুন দেয়াশলাই ছাড়া ড্রয়ার পুরোপুরি শূন্য। রাত বাজছে এগারটা পঁচিশ। সিগারেটের জন্যে হেঁটে-হেঁটে রাস্তার মোড় পর্যন্ত যেতে হবে। প্রায় বিশ মিনিটের পথ। যে পাগলা কুকুর ড্রাইভারের হেলপারকে কামড়েছে সে নিশ্চয়ই এই অঞ্চলেরই বাসিন্দা। সুযোগ পেলে তাকেও কামড়াবে। পাগলা কুকুরের নিয়ম হচ্ছে সাতজনকে কামড়ানো। তারিন তাই বলত। অদ্ভুত-অদ্ভুত সব তথ্য তারিনের মাথায়। বিড়াল নাকি চোখ ফোটার আগে তার বাচ্চাকে সাত বাড়ি ঘুরিয়ে আনে। জোড় বাচ্চা রাখে না। যে বিড়ালের চারটা বাচ্চা সে একটাকে মেরে সংখ্যা বিজোড় করে ফেলে। কোত্থেকে সে এইসব যোগাড় করত কে জানে ?

খিদে লেগেছে। ভাত খাবার পর একটা সিগারেট খাওয়া যাবে না— এই চিন্তাটি তাকে অস্থির করে তুলল। আকাশের অবস্থাও ভালো না। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝড়-বৃষ্টির সময়। অথচ যেতে হবে ছাতা ছাড়া। প্রতি বর্ষাতেই তাকে একটি করে ছাতা কিনতে হয়। এবারের ছাতাটি সে গত সপ্তাহে কিনেছে। একদিন মাত্র ব্যবহার করেছে। তারপরই ছাতা নিখোঁজ। আরেকটি কিনতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এই বর্ষা ভিজেই কাটুক। আহসান খুলে ফেলা জুতা আবার পরতে বসল। সিগারেট না আনলেই নয়। নেশার জিনিস ফুরিয়ে গেলে খুব অস্থির লাগে।

জায়গাটার আসলেই একটা রহস্য আছে। গন্ধটা এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। সে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল। যদি পাওয়া যায়। অপেক্ষাটা বিপজ্জনক— আকাশের অবস্থা বেশ খারাপ। বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে তুমুল বর্ষণ হবে। কিন্তু জায়গাটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কেন মাঝে-মাঝে চমৎকার একটা গন্ধ এ-জায়গাটায় পাওয়া যায় ? কারো সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করলে হয়। আলাপের জন্যে বিষয়টি অবশ্যি খুবই তুচ্ছ। তবু মাঝে-মাঝে তুচ্ছ জিনিস নিয়ে আলাপ করতে ইচ্ছা করে। চার বছর আগে তারিন ছিল। যে-কোনো তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করা যেত তার

সঙ্গে। চমৎকার সময় কাটত। একবার তারিন নিউমার্কেটে যাবার পথে দেখল একটা মহিষকে ঠেলাগাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছে। সে বাসায় ফিরল দারুণ উত্তেজিত হয়ে।

আজ একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম— মহিষকে ঠেলাগাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছে।

আহসান হাই তুলে বলল, এটা অদ্ভুত কিছু না। গরু-মহিষকে প্রায়ই ঠেলাগাড়িতে করে নিয়ে যায়। এরা হাঁটতে পারে না বলে এই ব্যবস্থা। তুমি যদি দেখতে একটা বাঘকে ঠেলাগাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছে তাহলেও একটা কথা ছিল।

মহিষটা অসুস্থ না, খুবই সুস্থ।

সুস্থ হলে একে ঠেলাগাড়িতে করে নিয়ে যাবে কেন ?

তারিন হাসতে-হাসতে বলল, আমি জানি কেন নিয়ে যাচ্ছে। তুমি যদি বলতে পার তাহলে তোমার জন্যে পুরস্কার আছে।

কী পুরস্কার আগে বলো।

না, আগে-ভাগে বলা যাবে না।

তুমি যদি একটি বিশেষ পুরস্কার আমাকে দাও তাহলে চেষ্টা করে দেখতে রাজি আছি।

কী অসভ্যতা করছ ? ছি!

অসভ্যতা কী করলাম ? আমি একটি বিশেষ পুরস্কারের কথা বলছি। এর বেশি তো কিছু বলি নি।

থাক তোমাকে কিছু বলতে হবে না।

রাগ করে উঠে চলে যায় তারিন। সেই রাগ ভাঙাতে আহসানকে যথেষ্ট কষ্ট করতে হয়। শেষ পর্যন্ত রাগ ভাঙে এবং আহসান অনুমান করতে চেষ্টা করে কেন মহিষটিকে ঠেলাগাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছে।

মহিষটার একটা পা ছিল খোঁড়া।

হলো না।

গাড়ির নিচে পড়ে জখম হয়েছে, হাঁটতে পারছে না তাই...

হলো না।

মহিষটা সম্ভবত বিয়ে করতে যাচ্ছে...

ফাজলামি করবে না, ঠিকমতো বলো।

পারছি না। তুমি বলে দাও।

মহিষটার একটা ছোট্ট বাচ্চা আছে। বাচ্চাটা হাঁটতে পারে না বলে বাচ্চা এবং মা ঠেলাগাড়িতে করে যাচ্ছে। এই সহজ জিনিসটা বলতে পারলে না ?

তুমি বলছ মহিষ। মহিষ হচ্ছে পুংলিঙ্গ। ম্যাসকুলিন জেন্ডার। আমি বুঝব কী করে এর একটা বাচ্চা আছে ?

মহিষ-এর স্ত্রীলিঙ্গ কী ?

মহিষী কিংবা মহিষিনী কিংবা মহিলা মহিষ।

ওমা, তুমি জানো না নাকি ?

না, জানি না।

প্রফেসর মানুষ, আর এই সাধারণ জিনিসটা তুমি জানো না ?

আমি কি বাংলার প্রফেসর নাকি যে জানব ? আমি হচ্ছি যুক্তিবিদ্যার অধ্যাপক।

যুক্তিবিদ্যা তো তুমি আরো কম জানো।

কী করে বুঝলে ?

আমার সঙ্গে তো কোনো যুক্তিতেই তুমি পার না।

অর্থহীন কথা। বলার জন্যেই কথা বলা। এর বেশি কিছু না। কিন্তু কী অপূর্ব ছিল সেই অর্থহীন কথাবার্তা। তারিন যদি আজ থাকত তাহলে নিশ্চয়ই এই হঠাৎ আসা গন্ধের রহস্য বের করে ফেলত। কোনো এক রাতে ঘুমোতে যাবার আগে কৃত্রিম একটা হাই তুলে বলত, গন্ধ-রহস্যের সমাধান হয়েছে।

কী সমাধান ?

আজ বলা যাবে না, ঘুম পাচ্ছে।

আহ্, বলো না।

বললাম তো ঘুম পাচ্ছে।

আরেকবার হাই তুলে এমন ভাব করত যাতে মনে হতে পারে সত্যি-সত্যি ঘুম পেয়েছে।

আহসান অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। ছোট ছোট কয়েকটি বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে পড়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। রাত অনেক হয়েছে। বৃষ্টিবাদলা দেখলে দোকানপাট বন্ধ করে দোকানিরা বাড়ি চলে যাবে। মস্তান ধরনের ছেলেপুলে বোতল হাতে নিরিবিলি জায়গার খোঁজে আসবে এদিক দিয়েই। এটি মোটামুটি নির্জন অঞ্চল। ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে এরকম একটি ঘরে তাদের আসর বসবে।

এ-জাতীয় একটি দলের সামনে একবার আহসান পড়ে গিয়েছিল। রাত বেশি হয় নি, দশটা-সাড়ে দশটা। পাঁচ-ছ'টি ছেলের একটা দল একটি মেয়ের

হাত ধরে টানতে-টানতে নিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটি যেতে চাচ্ছে না। ল্যাম্প-পোস্টের আলোয় মেয়েটিকে চমৎকার লাগছে। রোগা, লম্বা একটি মেয়ে, কচি মুখ। এ-সব ক্ষেত্রে কোনোরকম কথা না-বলাই বিচক্ষণতার লক্ষণ। কিন্তু আহসান অসম্ভব সাহস দেখাল। কড়া গলায় বলল, অ্যাই, কী ব্যাপার ? কী হচ্ছে ?

দলটি থেমে গেল। মেয়েটি হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছে। যে তার হাত ধরে আছে সে চিকন গলায় বলল, আপনি যা ভাবছেন তা না ব্রাদার। ভদ্রঘরের মেয়ে না। ট্রিপ দেওয়া মেয়ে। জায়গায়-জায়গায় ট্রিপ দেয়। একসঙ্গে বেশি কাস্টমার দেখে ঘাবড়ে গেছে।

বলার ভঙ্গিটি এতই কুৎসিত যে গা জ্বালা করে। কিন্তু জ্বালা করা পর্যন্তই। কিছুই করবার নেই। তবে ঐ মেয়েটি আজেবাজে ধরনের মেয়েই ছিল। কারণ আহসান দেখল মেয়েটি বেশ সহজভাবেই যাচ্ছে। তাকে আর আগের মতো টেনে-হিঁচড়ে নিতে হচ্ছে না। অল্প বয়সের এরকম সুশ্রী একটি মেয়ের এ কী দুর্দশা! মেয়েটি যেতে-যেতে একবার বলল, এমুন করেন ক্যান ? যাইতেছি তো। সক্কাল সক্কাল ছাড়বেন কিন্তুক।

এর উত্তরে ছেলেদের একজন কী বলল ঠিক বোঝা গেল না, তবে নিশ্চয়ই হাসির কিছু। মেয়েটি খিল-খিল করে হাসছে। অর্থহীন হাসি।

আহসান দু' প্যাকেট সিগারেট কিনল। সবকিছু বেশি-বেশি থাকাই ভালো। সিগারেটওয়ালার মুখে অসম্ভব বিরক্তি। শেষ সময়ে দু' প্যাকেট সিগারেট বিক্রি করেও তার বিরক্তি দূর হলো না। টাকার ভাংতি হিসাব করছে— এই জন্যেই কি বিরক্তি ? নাকি তারও খিদে পেয়েছে— বাড়ি যেতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু যেতে পারছে না, কারণ বিক্রি ভালো হয় নি। আহসান লোকটির বিরক্তি কমাবার জন্যে হালকা গলায় বলল, একটা পাগলা কুকুর নাকি বেরিয়েছে, জানো নাকি ?

জানি না।

লোকটি মুখ আরো বিরস করে ফেলল। পাগলা কুকুর কেন, বাঘ বেরুলেও তার কিছু যায়-আসে না।

আহসানের ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। একবার ঘরে ঢুকলে বেরুতে ইচ্ছে করে না, আবার বেরুলে ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করে না। অদ্ভুত অবস্থা। সকালে নাশতার কিছু নেই। নূর বেকারি খোলা। সে কলা এবং রুটি কিনল।

আজ সকালে ঘরে নাশতার কিছু ছিল না বলে, না খেয়ে কলেজে ছুটতে হয়েছে। দু'টি দেয়াশলাই কিনে টাকা দেবার সময় মনে পড়ল ড্রয়ারে পুরো এক প্যাকেট দেয়াশলাই দেখে এসেছে। কোন জিনিস আছে কোন জিনিস নেই তার

কোনো হিসাব থাকছে না। যা নেই তা কেনা হচ্ছে না। যেটা আছে সেটাই কেনা হচ্ছে। হয়তো ঘরে গিয়ে দেখবে পাউরুটিও একটি পড়ে আছে।

নূর বেকারির ছেলেটিকে দেখে মনে হচ্ছে আলাপী। আহসান অন্তরঙ্গ সুর বের করল, একটা নাকি পাগলা কুকুর বের হয়েছে, জানো কিছু ?

ছেলেটি জবাব দিল না। রাগী চোখে তাকাল। 'তুমি' করে বলায় হয়তো রক্ত গরম হয়ে গেছে। মাস্টারি করে এই সমস্যা হয়েছে— সবাইকে ছাত্র মনে হয়।

খিদে জানান দিচ্ছে। আহসান খিদে-পেটেই সিগারেট ধরাল, ঠিক তখন হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামল। ঝুম বৃষ্টি। এ-বৃষ্টি থামবে না। ধরন দেখেই বলে দেওয়া যায়— সারা রাত চলবে। দৌড়ে কোথাও দাঁড়ানোর কোনো মানে হয় না। শেষ পর্যন্ত কাকভেজা হয়েই বাসায় ফিরতে হবে। তবু বৃষ্টি নামলেই কোথাও দাঁড়াতে ইচ্ছে করে। আহসান ছুটে গিয়ে দাঁড়াল মেসার্স রহমানিয়ার বারান্দায়। মাথার উপর খানিকটা ছাদের মতো আছে। তাতে বৃষ্টি আটকাচ্ছে না। আশ্রয়ের খোঁজে আরো কিছু লোকজন এসেছে। একজন ভিখিরি, সঙ্গে ইঁদুরের বাচ্চার মতো কৃশ একটি বাচ্চা। বাচ্চাটি গভীর রাতেও জেগে আছে। চোখ বড়-বড় করে তাকাচ্ছে। একজন বুড়ো লোক যাকে প্রথম দৃষ্টিতে ভিখিরি মনে হলেও সে ভিখিরি নয়। কারণ তার হাতে একটি বাজারের থলে আছে। সেই থলের ভেতর থেকে লাউয়ের মাথা বের হয়ে আছে। ভিখিরির কাছে বাজারের থলে থাকে না। এই বুড়ো গভীর রাতে বাজার করে কোথায় ফিরছে কে জানে। একেকবার বৃষ্টির ঝাপটা আসছে আর এই বুড়ো থু করে থুথু ফেলছে।

কোণের দিকে প্রায় দেয়াল ঘেঁসে লম্বা রোগা একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবত ঐদিনকার সেই মেয়েটি। মেয়েটি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে আলো নেই, মুখ দেখা যাচ্ছে না। মুখ দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে, আবার হচ্ছেও না। থলে হাতে বুড়োটি মেয়েটির দিকে কয়েকবার তাকিয়ে ঝাঁঝালোভাবে কী সব বলল। আহসান শুনতে পেল না। ভিখিরি মেয়েটি শুনল এবং হাসতে-হাসতে ভেঙে পড়ার মতো হলো। ভিখিরির শিশুটি হয়তো তার মা'র হাসি শুনে অভ্যস্ত নয়। সে কেঁদে উঠল। ভিখিরিটির হাসি আর থামেই না। আহসানের বুকে ছোট্ট একটি ধাক্কা লাগল। তারিনের হাসির সঙ্গে এই মেয়েটির হাসির মধ্যে কোথায় যেন একটি মিল আছে। ধ্বনির মিল— যা মাথায় ঢুকে ঝন-ঝন করে বাজে। কেন জানি হাসি শুনতে ইচ্ছে করছে না। আহসান বৃষ্টি মাথায় করেই রাস্তায় নামল। আশ্চর্যের ব্যাপার, লম্বা মেয়েটিও তার সঙ্গে-সঙ্গে নেমে আসছে। আজ বোধহয় বেচারির ভাগ্যে কিছু জোটে নি।

একজনের সঙ্গে অন্য একজনের মিলের ব্যাপারটা বোধহয় মনগড়া। আসলে তেমন কোনো মিল থাকে না। মিল কল্পনা করা হয়। আমরা একজনের

চোখে অন্য একজনের ছায়া দেখি। একজনের চুল অন্য একজনের চুলের কথা মনে করিয়ে দেয়। তারিনের মৃত্যুর পরপর এই ব্যাপারে খুব ঘটত। হয়তো একটা মেয়ে রিকশা করে যাচ্ছে। হুড তোলা হয় নি, বাতাসে মেয়েটির চুল উড়ছে। সাধারণ দৃশ্য। তবু বুকের মধ্যে ধক করে উঠবে— আরে, এই মেয়েটি তো তারিনের মতো! রিকশা চলে না-যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে থাকতে হবে। বুকের কোন গহীন গোপনে ব্যথা ছলছলিয়ে উঠবে।

একবার ক্লাসে এরকম হলো। সেকেন্ড ইয়ার অনার্স ক্লাস। অ্যাসথেটিকস পড়ানো হবে। রোল কল করা হচ্ছে। রোল ফিফটি এইট বলা মাত্র একটি মেয়ে বলল, প্রেজেন্ট স্যার। আহসান হতভম্ব! আরে, এর গলা তো অবিকল তারিনের গলার মতো।

আহসান সেই স্বর দ্বিতীয়বার শোনার জন্যে আবার বলল, রোল ফিফটি এইট।

প্রেজেন্ট স্যার।

আবার শুনতে ইচ্ছে করছে। একটা রোল তিনবার ডাকা যায় না। আহসান বলল, রোল ফিফটি এইট, তুমি এত অ্যাবসেন্ট থাক কেন?

স্যার, আমি তো অ্যাবসেন্ট থাকি না।

ও আচ্ছা। আমার ভুল হয়েছে— বসো।

মেয়েটি বসে পড়ল। সে বেশ বিব্রত বোধ করছে। তার দু'পাশের বান্ধবীরা মুখ টিপে হাসছে। একজন সম্ভবত পেনসিল দিয়ে খোঁচাও দিল। এ-কালের মেয়েগুলি ফাজিলের চূড়ান্ত। সহজ কথারও তিনরকম অর্থ করে মজা পায়।

বৃষ্টি যতটা জোরালো মনে হচ্ছিল ততটা জোরালো নয়। কুয়াশার মতো পড়ছে। বাসা পর্যন্ত যেতে মাথা সামান্য ভিজবে, এর বেশি কিছু হবে না। ঝম-ঝম বৃষ্টি হলে মন্দ হতো না। অনেকদিন ঝুম বৃষ্টিতে ভেজা হয় না।

মেয়েটি আসছে তার পিছনে-পিছনে। স্যান্ডেল খুলে হাতে নিয়েছে, পা ফেলছে খুব সাবধানে। এর বাড়ি বোধহয় আশেপাশে কোথাও হবে। একা-একা যেতে ভয় পাচ্ছে বলে সঙ্গে আসছে। আসুক, ক্ষতি তো কিছু নেই। এত সাবধানতায়ও কাজ দিল না। মেয়েটি পা পিছলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। অন্ধকারে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তবে সে যে কাদায় মাখামাখি হয়েছে এটা বোঝা যাচ্ছে। এগিয়ে এসে হাত ধরে তোলার কোনো অর্থ হয় না। আবার পাশ-কেটে চলে যেতেও খারাপ লাগে।

এই জাতীয় মেয়ের সংখ্যা শহরে দ্রুত বাড়ছে। কলেজের ইসমাইল সাহেবের ধারণা শহরটা প্রসটিটিউটের শহর হয়ে যাচ্ছে। ইসমাইল সাহেব লোকটি বেশ রসিক। যাই বলেন শুনতে ভালো লাগে।

বুঝলেন সাহেব, ঐ-রকম একজনের পাল্লায় পড়েছিলাম। রাত দশটার মতো বাজে। আমার ভায়রার বাসায় বেড়াতে যাচ্ছি ঝিকাতলা। একটু ভেতরের দিকে। রিকশা ছেড়ে দিয়ে হাঁটছি, তখন এই মেয়েটা এসে উপস্থিত। নরম গলায় বলল, আজ রাতটা কি আপনি আমাকে থাকতে দিতে পারেন?

আমি তো বুঝতেই পারি নাই রে ভাই। কচি চেহারা, ভদ্র সাজ-পোশাক।

আপনি কী বললেন?

আমি বললাম, কী অসুবিধা তোমার?

জিওগ্রাফির মনসুর সাহেব চাপা হাসি হেসে বললেন, মা বলে ডাকলেন না? আপনার তো আবার মেয়েদের মা ডাকার একটা প্রবণতা আছে।

না, মা ডাকি নি। কলেজের মেয়েগুলিকে মা বলি। বাইরে বলি না। তারপর কী হলো শোনেন— আমি বললাম, কী অসুবিধা তোমার?... সে বলল, অনেক অসুবিধা। বলেই হাসল, তখনই ব্যাপারটা বুঝলাম।

কী করলেন?

পাঁচটা টাকা দিলাম। টাকাটা নিল না। তখনই বুঝলাম ভালো ফ্যামিলির মেয়ে, ছ্যাঁচড়া ধরনের হলে নিত।

মনসুর সাহেব বাঁকা হাসি হেসে বললেন, আপনার মনের অবস্থাটা তখন কী হলো বলুন।

কী আবার হবে। কিছু হয় নি— একটু স্যাড ফিল করেছি।

শুধু স্যাড, আর কিছু না? একবারের জন্যেও কি মনে হয় নি এই মেয়েটির সঙ্গে কিছু সময় কাটালে কী আর এমন ক্ষতি হবে? ঘরে ফিরলে সেই তো বাসি স্ত্রী। অর্থের বিনিময়ে টাটকা একজন তরুণীর সঙ্গ— মন্দ কী?

কী-সব বাজে কথা বলছেন মনসুর সাহেব?

বাজে কথা একেবারেই বলছি না। নিতান্ত সত্যি কথাটা বলছি। হার্ড ট্রুথ।

নিজেকে দিয়ে সবাইকে বিচার করবেন না।

নিজেকে দিয়ে বিচার করছি না— আপনাকে দিয়েই আমি আপনাকে বিচার করছি। এই যে মেয়েগুলিকে আপনি মা মা ডাকেন, তার পিছনে কি অন্য কিছু কাজ করে না? মা বলে সহজেই একজনের পিঠে হাত রাখতে পারছেন। স্পর্শের আনন্দটুকুর জন্যে আপনি মা ডাকছেন। আমি খুব ভুল বলছি?

ইসমাইল সাহেব স্যান্ডেল খুলে মনসুর সাহেবকে মারতে গেলেন। কেলেঙ্কারি ব্যাপার। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পর্যন্ত জিনিসটা গড়াল। প্রিন্সিপ্যাল দার্শনিকের মতো বললেন, মেয়েমানুষ কী জিনিস দেখলেন? সামান্য মেয়েমানুষের কথা থেকে স্যান্ডেল নিয়ে ছোটাছুটি। এই খবর বাইরে লিক হলে

টিচার্স কম্যুনিটি হিসেবে আমাদের স্থান কোথায় হবে বলেন দেখি ? আপনাদের মতো হাইলি এডুকেটেড লোক যদি...

বৃষ্টি এবার বড় বড় ফোঁটায় পড়তে শুরু করেছে। আহসান তার পাউরুটি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ভেজা পাউরুটি নিয়ে ঘরে ফেরার কোনো অর্থ হয় না। মেয়েটিকে পাউরুটিটা দিয়ে দিলে কেমন হয় ? চিন্তাটা মাথায় আসায় আহসান অস্বস্তি বোধ করছে। হঠাৎ একটা পাউরুটি দেওয়ার কথা তার মনে হলো কেন ? কেন সে পাউরুটি দিতে চাচ্ছে ?

মেয়েটি অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে কী যেন খুঁজছে। তার মধ্যে এক-ধরনের ব্যাকুলতা। কিছু বলবে না বলবে না ভেবেও আহসান বলল, কী খুঁজছ ? বলেই সে নিজে চমকে উঠল। সে কী খুঁজছে না খুঁজছে তা নিয়ে আহসানের মাথাব্যথা কেন ?

মেয়েটি খোঁজা বন্ধ করে আহসানকে দেখছে। জায়গাটা অন্ধকার, সে নিশ্চয়ই কিছু দেখতে পাচ্ছে না। মেয়েটি নিচু গলায় বলল, আমার স্যান্ডেল খুঁজতেছি।

তুমি কি এই দিকে থাক ?

না।

কোথায় থাক ?

মেয়েটি জবাব দিল না। ঝুম বৃষ্টি চলছে। এর মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। কিন্তু সে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যাতে মনে হতে পারে সে অপেক্ষা করছে মেয়েটির জন্যে।

স্যান্ডেল পাওয়া গেছে ?

না।

নাম কী তোমার ?

রেবা।

এটা নিশ্চয়ই ছদ্মনাম। আসল নাম অন্য কিছু। ঠিক নামটি এরা কখনো বলে না।

এটা তোমার ঠিক নাম ?

না।

আহসান পা বাড়াল। আশ্চর্য, মেয়েটিও আসছে। আহসান থমকে দাঁড়িয়ে গেল। শীতল গলায় বলল, আমার সঙ্গে-সঙ্গে আসছ কেন ?

মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু আবার হাঁটতে শুরু করল, আহসানের পাশে পাশে আসছে। দু'জন মানুষ পাশাপাশি হাঁটছে অথচ কেউ কোনো কথা বলছে

না। জায়গায়-জায়গায় পানি জমে আছে। পা পড়তেই ছপ-ছপ শব্দ হচ্ছে। চারদিকে ব্যাঙ ডাকছে। জায়গাটা পুরোপুরি গ্রামের মতো হয়ে গেছে। ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়ে নিকষ অন্ধকার। তারিনকে নিয়ে একবার ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে আঠারবাড়ি স্টেশন থেকে হেঁটে-হেঁটে কুতুবপুর যেতে হয়েছিল। কী ফুর্তি তার! আহসান বারবার বলছিল, হাত ধরে হাঁট, পিছলে পড়বে।

তারিন হাসতে-হাসতে বলেছে, পিছলে পড়লে একা পড়ব। তোমার হাত ধরে থাকলে তুমিও পড়বে। দু'জন পড়লে লাভ কী বলো ?

তার কথা শেষ হবার আগেই আহসান নিজে পিছলে পড়ল। তারিনের হাসি আর থামেই না।

আহ্ কী করছ ? লোকজন জড়ো হবে।

হোক জড়ো। হাসার সময় হাসব। কাঁদার সময় কাঁদব।

সত্যি-সত্যি তারিনের হাসিতে লোকজন এসে পড়ল। তারা কিছুতেই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে যেতে দেবে না। তারিন যাবেই। শেষ পর্যন্ত একদল লোক সঙ্গে নিয়ে রওনা হতে হলো। একজন একটি ছাতা ধরে থাকল তারিনের মাথায়। একটা টর্চ-লাইটও যোগাড় হয়েছিল। টর্চ-লাইটধারী আগে-আগে আলো ফেলতে লাগল। তারিনের আনন্দ পুরোপুরি মাঠে মারা গেল।

এইসব যেন অন্য কোনো জন্মের কথা। এই জন্মের নয়। এই জন্মে লম্বা রোগা একটি মেয়ে তার সঙ্গে-সঙ্গে আসছে। তার একহাতে একটিমাত্র স্যান্ডেল, অন্য স্যান্ডেলটি সে খুঁজে পায় নি। হয়তো দিনের বেলা গিয়ে খুঁজবে। সেই জন্যেই এটি সে সঙ্গে করে আনছে।

এই মেয়ে ?

হুঁ।

তুমি আমার সঙ্গে-সঙ্গে আসছ কেন ? স্টপ। আসবে না। যত বাজে ঝামেলা। বাড়ি যাও।

এই জাতীয় মেয়েরা কত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকে কে জানে। এরা কি একা-একাই বাড়ি ফেরে, না কেউ এসে নিয়ে যায় ? হয়তো বাড়ি থেকে কেউ এসে নিয়ে যায়। কিংবা কোনো রিকশাওয়ালার সঙ্গে ঠিকঠাক করা থাকে। এরা এসে বাড়ি নিয়ে যায়। আজ ঝড়-বৃষ্টির জন্যে কেউ আসে নি।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। এখন আর পিছনে-পিছনে আসছে না। মেয়েটি একা-একা কোথায় যাবে ? আহসান ঠাণ্ডা গলায় বলল, বাড়ি চলে যাও। আমার পিছনে-পিছনে এসে লাভ হবে না। বাড়ি যেতে পারবে না একা-একা ?

মেয়েটি জবাব দিল না।

বাসা কোথায় তোমার ?

কল্যাণপুর।

রিকশা এখন পাবে না। যাবে কীভাবে ?

মেয়েটি উল্টোদিকে ফিরে হাঁটতে শুরু করল।

অ্যাই শোন। অ্যাই।

মেয়েটি ফিরল না। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। যাক যেখানে ইচ্ছে। আহসান হাঁটতে শুরু করল। ঠাণ্ডায় গা কাঁপছে, নির্ঘাৎ জ্বর আসবে। বাড়ির গেট পর্যন্ত এসে একবার পিছনে তাকাল।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বিদ্যুতের আলোয় দেখা যাচ্ছে মেয়েটি রাস্তার একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সে হয়তো ভাবছে এই লোকটি আবার তাকে ডাকতে আসবে। কিংবা একা-একা ফিরে যেতে সে ভয় পাচ্ছে।

আহসান তাকে সত্যি-সত্যি ডাকল। কেন ডাকল তা সে নিজেই জানে না। এই মেয়েটির গলার স্বর তারিনের মতো— শুধু এই কারণে, নাকি সে ঝড়-বৃষ্টির রাতে নারী-সঙ্গ কামনা করছে ?

তারিনের শাড়ি মেয়েটিকে পরতে দেওয়া উচিত হয় নি। খুব অন্যায় হয়েছে। অন্যায়ের ব্যাপারটা অনেকটা চেইন রি-অ্যাকশনের মতো। একটি অন্যায় করলেই পরপর অনেকগুলো করতে হয়।

মেয়েটি বৃষ্টিতে ভিজছিল, এত রাতে কোথায় কীভাবে যাবে— শুধু এই ভেবেই কি আহসান তাকে ডেকেছে ? তার অবচেতন মনে কি অন্য কিছু লুকিয়ে আছে ? থাকাটাই কি স্বাভাবিক নয় ? এই নির্জন বাড়ি, বৃষ্টির রাত, সুশ্রী চেহারার একটি মেয়ে। আহসানের মাথা ধরে গেল।

ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পড়েছিলে, যাবার জায়গা নেই— এই-জন্যেই তোমাকে এনেছি। অন্য কিছু নয়।

মেয়েটি কিছু বলল না। কিন্তু আহসানের মনে হলো মেয়েটি ঠোঁটের ফাঁকে একটু যেন হাসল। আহসানের কথা ঠিক বিশ্বাস করল না। শুধু কি এই মেয়ে ? আহসান নিজেও কি নিজের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে ? তারিনের হালকা সবুজ শাড়িতে মেয়েটিকে সত্যি-সত্যি চমৎকার লাগছে। কত বয়স হবে মেয়েটির ? আঠার, উনিশ নাকি তার চেয়েও কম ? তারুণ্যের আভা চোখে-মুখে। চোখের কোলে অবশ্যি কালি পড়েছে। তাতে আরো চমৎকার লাগছে। মেয়েটি কী মনে করে মাথায় ঘোমটা তুলে দিল। এটা সে কেন করল কে জানে। এখন বউ-বউ একটা ভাব মেয়েটির মধ্যে চলে এসেছে। বউ মানেই তো কোমল একটা ব্যাপার। স্বপ্ন এবং কল্পনা মেশানো ছবি।

আহসান বলল, আমি এখন ভাত খাব। তুমি কি খাবে ?

না।

খেতে চাইলে খেতে পার। রাতে খেয়েছ কিছু ?

না।

তাহলে খাবে না কেন ?

মেয়েটি কিছু বলল না। আহসানের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল। ভালো লাগল দেখতে। কিন্তু এই হাসি তৈরি হাসি। মানুষ ভোলানো হাসি। যে-কোনো পুরুষের কাছে গিয়েই এই মেয়ে এমন সুন্দর করে হাসে। তা-ই নিয়ম।

তুমি এমন ঠোঁট টিপে হাসছ কেন ?

মেয়েটি জবাব দিল না। কৌতূহলী চোখে চারদিকে দেখতে লাগল। তার দৃষ্টি আটকে গেল পড়ার টেবিলে রাখা চীনামাটির পুতুলটির উপর। তারিনের পুতুল। বিয়ের পর সে অল্প যে-সব জিনিস বাবার বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে এটি তার একটি। তারিনের খুব শখের জিনিস।

ভাত-তরকারি ঠাণ্ডায় প্রায় জমে যাবার মতো হয়ে আছে। আহসান কেরোসিনের চুলা ধরাল। গরম না-করে কিছু মুখে দেওয়া যাবে না। মেয়েটি পিছনে-পিছনে এসেছে, দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

এই বাড়িতে আর কেউ থাকে না ?

প্রশ্নটি সে করল এমনভাবে যেন জবাবের জন্যে তার কোনো আগ্রহ নেই। আহসান ঠাণ্ডা গলায় বলল, না।

রান্না করে কে ?

একটা কাজের মেয়ে আছে। সে রান্না করে দিয়ে যায়। আমি এখানে শুধু রাতে খাই। দিনে বাইরে খাই। হোটেল-টোটেলে খেয়ে নিই।

এতগুলো কথা মেয়েটিকে বলার দরকার ছিল কি কোনো ? কোনোই দরকার ছিল না। কিন্তু তবু সে বলেছে। কেন বলল ?

পেটে খিদে থাকলে এসো, খাও।

মেয়েটি এলো। তার সম্ভবত প্রচুর খিদে ছিল। খুব আগ্রহ করে খেতে লাগল। খাবার সময়টায় একবারও আহসানের দিকে তাকাল না। এখনো মাথায় ঘোমটা।

তোমার কী যেন নাম ?

পারুল।

আগে তো বলেছিলে রেবা ? কোনটা তোমার আসল নাম ?

পারুল।

শোন পারুল, তুমি সকাল হলেই এখান থেকে চলে যাবে এবং আর কোনোদিন আসবে না।

আচ্ছা।

রোজই কি তুমি রাতে বের হও ?

না।

তোমার বাসায় কে আছে ?

মেয়েটি জবাব দিল না।

এই যে আজ রাতে বাসায় ফিরলে না— বাসার লোকজন চিন্তা করবে না ?

না।

বাসায় তোমার কে আছে ?

মেয়েটি জবাব দিল না। একবার শুধু মুখ তুলে তাকাল।

সংসার আছে ? অর্থাৎ স্বামী পুত্র কন্যা— এরা কেউ ?

মেয়েটি উত্তর না দিয়ে থালাহাতে উঠে পড়ল। তার খাওয়া হয়ে গেছে। আহসান বলল, থালা-বাসন ধোয়ার দরকার নেই। সকালে রহিমার মা এসে ধোবে। রেখে দাও ওখানে।

মেয়েটি রাখল না। অনেকখানি সময় নিয়ে নিজের প্লেট পরিষ্কার করল।

বললাম না এগুলো ধোয়ার দরকার নেই। রেখে দাও। এসো আমার সঙ্গে। ঘুমুবার জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি।

মেয়েটি উঠে এলো।

এই ঘরে শোবে। মশারি-টশারি সবই আছে। তোমার যদি আগে ঘুম ভাঙে আমাকে ডাকবে। আমি গেট খুলে দেব। বাসায় চলে যাবে।

আচ্ছা।

দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়।

মেয়েটি অবাক হয়ে বলল, আপনার আর কিছু লাগবে না ?

না, লাগবে না। তুমি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ কর। নিচে ছিটকিনি আছে। আহ্, দেরি করছ কেন, ছিটকিনি লাগাও।

আপনি কি আমার উপর রাগ করলেন ?

না, রাগ করি নি। রাগের কোনো ব্যাপার না। ছিটকিনি দাও। সকালে উঠে চলে যাবে।

ছিটকিনি পড়ার শব্দ হলো।

জালাল মিয়া ট্রাক নিয়ে এসেছে মনে হচ্ছে। একটু আগে ট্রাকের শব্দ পাওয়া গিয়েছিল, এখন কোলাপসিবল গেটের তালা খোলার শব্দ আসছে।

করিম সাহেব নিজে এই তালাটি রাত দশটার দিকে লাগিয়ে দেন। সব ভাড়াটেদের কাছে এর একটা চাবি আছে। দশটার পর এলে নিজেদের চাবিতে গেট খুলতে হয়।

জালাল মিয়া একা আসে নি, আরো লোকজন এসেছে। কান্নাকাটির কোনোরকম আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। তার মানে করিম সাহেব এখনো টিকে আছেন। নিচে একবার যাওয়া উচিত, কিন্তু ইচ্ছে করছে না। বৃষ্টি কমে আসছে। বাতাসের বেগও কমছে। ঘটাং-ঘটাং করে জানালার একটা পাট এতক্ষণ নড়ছিল। এখন আর নড়ছে না।

পরপর তিনটি সিগারেট শেষ করে আহসান ঘুমোতে গেল। তার ধারণা ছিল— ঘুম আসবে না, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে হবে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, শোয়ামাত্রই ঘুমে চোখ জড়িয়ে এলো।

ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। রোদে ঝলমল করছে চারদিক। ঘড়িতে বাজছে ন'টা। চমৎকার সকাল। মন ভালো করে দেবার মতো চমৎকার।

আশ্চর্যের ব্যাপার, মেয়েটি তাকে কিছু না বলেই চলে গেছে। বিছানা পরিপাটি করে গোছানো। পরনের শাড়ি ভাঁজ করে আলনায় রাখা। বারান্দায় এক পাটি স্যান্ডেল ছিল, সেটিও নেই। মেয়েটি গেট দিয়ে বেরুবার সময় কেউ কি দেখেছে ? আহসানের অস্বস্তির সীমা রইল না। একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল।

একতলায় কে যেন রেডিও চালিয়েছে। শিল্প-সাহিত্য নিয়ে কেউ একজন একঘেয়ে গলায় ভ্যাজর-ভ্যাজর করছে।

ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যজনক। যে-বাড়ির প্রধান ব্যক্তিটি হাসপাতালে মর-মর সে-বাড়িতে শিল্প-সাহিত্য শুনবার জন্যে কেউ রেডিও খুলবে এটা ভাবা যায়

না। আহসান বারান্দায় এসে দাঁড়াল। রেডিও বন্ধ হয়েছে। কেউ বোধহয় মনের ভুলে সুইচ টিপেছিল।

এরকম হয়। তারিন মারা যাবার পর ঠিক এই জিনিসই হয়েছিল। হাসপাতাল থেকে আহসান একটা বেবিটেক্সি নিয়ে চলে গেল ঝিকাতলার বাসায়। সেই সময় বাসায় আসার তার কোনোই প্রয়োজন ছিল না। কেন যে এসেছে সে সম্পর্কে তার ধারণাও স্পষ্ট নয়। পাশের বাড়ির নীলা ভাবি বললেন, হাসপাতাল থেকে আসছেন নাকি ভাই ? খবর আছে কিছু ?

আহসান কিছু বলল না। নীলা ভাবি বললেন, বুঝতে পারছি আনন্দের কোনো খবর এখনো হয় নি। এত যখন ঝামেলা হচ্ছে তখন ছেলে হবে। ছেলেগুলো বড্ড ঝামেলা করে রে ভাই। সহজে পৃথিবীতে আসতে চায় না।

আহসান জবাব না দিয়ে ঘরে ঢুকল। কাজের একটি বার-তের বছরের মেয়ে ছিল, তাকে চা বানাবার কথা বলে সে শোবার ঘরের খাটে বসে রইল। তার নিজেরও খেয়াল নেই কখন সে বিছানার উপর রাখা ক্যাসেট প্লেয়ারটি চালু করেছে। কী একটা হিন্দি গান হচ্ছে যেখানে 'ছুপ ছুপ কে' এই কথাগুলো বারবার আছে। কাজের মেয়েটি চা এনে জিজ্ঞেস করল, ভাইজান, আইজ হাসপাতালে খাওন নিবেন ?

ঠিক তখনই সমস্ত ব্যাপারটার অস্বাভাবিকতা আহসানের কাছে ধরা পড়ল। ক্যাসেটে গান হচ্ছে। চিকন গলায় একটি মেয়ে এবং মোটা গলায় একটি ছেলে খুব রহস্যময় ভঙ্গিতে গাইছে 'ছুপ ছুপ কে'। আহসান ক্যাসেট বন্ধ করল না। ঠাণ্ডা গলায় বলল, জাহানারা, খারাপ খবর আছে। তোর ভাবি মারা গেছে। এই কিছুক্ষণ আগে।

জাহানারা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। আহসান চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, চিনি দিয়ে তো শরবত বানিয়ে ফেলেছিস। এককাপ চা-ও ঠিকমতো বানাতে পারিস না। যা নতুন করে বানিয়ে আন।

জাহানারা অবিশ্বাসী গলায় বলল, ভাবি মারা গেছে ? কী কন ভাইজান!

হুঁ। ছেলেটা ভালো আছে। ছেলে হয়েছে একটা। বলেছি ?

আহসান উঠে দাঁড়িয়ে আবার বসে পড়ল। হাত বাড়িয়ে ক্যাসেটটা বন্ধ করে সহজ গলায় বলল, ভালো করে চা বানিয়ে আন। অনেক রকম ঝামেলা আছে।

জাহানারা প্রায় দৌড়ে গেল রান্নাঘরে। কিছুক্ষণ পর শোনা গেল সে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বড্ড বিরক্ত লেগেছিল কান্না শুনে। ইচ্ছে করছিল উঠে

গিয়ে কড়া একটা ধমক দিতে। ধমক দেওয়া হয় নি। কিছুক্ষণ পর জাহানারা চা নিয়ে এলো। সেই চা-ও মুখে দেওয়া যায় নি। আগেরবারের মতো চিনি দিয়ে শরবত। গরম করেছে আগুনের মতো। মুখে দিতেই জিব পুড়ে গেল।

আজ এ-বাড়িতেও হয়তো তাই হয়েছে। অবশ্যি কান্নার কোনো শব্দ আসছে না। ভদ্রলোকের পাঁচ মেয়ে। কিছু একটা হলে এরা কেঁদে বাড়ি মাথায় তুলবে। ঘন-ঘন ফিট-টিট হবে। আত্মীয়স্বজনে বাড়ি গিজ-গিজ করবে। হৈচৈ চেঁচামেচি। মৃত্যু যেমন কুৎসিত, তার পরবর্তী ব্যাপারগুলো তার চেয়েও কুৎসিত।

এ-বাড়িতে কুৎসিত অংশগুলো এখনো শুরু হচ্ছে না। তবে শুরু হতে কতক্ষণ। যে-কোনো সময় শুরু হয়ে যাবে। তার আগে একবার গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসা দরকার। এটা হচ্ছে সামাজিকতা। করুণ মুখে খোঁজ-খবর করতে হবে। একবার হাসপাতালে যেতেও হতে পারে।

বসার ঘরের কলিংবেল টিপতেই অপরিচিত একজন মাঝবয়েসী মহিলা বের হয়ে এলেন। বিরক্ত মুখে বললেন, কারে চান ?

করিম সাহেবের মেয়েরা কেউ আছে ?

কোন মেয়েরে চান ?

বড় মেয়ে কিংবা অন্য কেউ।

আপনে কে ?

আমি তিনতলায় থাকি। ইনাদের ভাড়াটে। আমার নাম আহসান।

আচ্ছা। বুঝছি। বসেন।

আহসান বসতে-বসতে বলল, করিম সাহেবের খবর নিতে এসেছি। উনার খবর কী ? কেমন আছেন এখন ?

ভালো না। অবস্থা খুবই খারাপ। আপনে বসেন, বেগমেরে ডাক দেই। ও বেগম, বেগম।

এই যুগে মেয়েদের নাম কেউ বেগম রাখে ? কী অদ্ভুত নাম এ-বাড়ির মেয়েদের— বেগম, শাহজাদী, মহল। মহল হচ্ছে তিন নম্বর মেয়েটি। এই মেয়েটি বড় দু'বোনের মতো নয়। একটু অন্যরকম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-নামতে দেখা হয়ে গেলে বড় দু'বোনের মতো শক্ত হয়ে যায় না। বরং হাসি-হাসি মুখে তাকায়। মাঝে-মধ্যে দু-একটা কথা-টথাও হয়। যেমন, আহসান যদি বলে, কি ভালো ? সে লাজুক স্বরে বলে, জি।

যাওয়া হচ্ছে কোথায় ? ছাদে ?

জি। আচার শুকাতে।

ভালো। বেশি করে আচার শুকাও। আচার ভালো জিনিস।

সন্ধ্যাবেলা ওদের কাজের মেয়ে বাটিভর্তি আচার নিয়ে উপস্থিত। আহসান চমকে উঠে বলেছে, আচার কী জন্যে ?

মহল আপা পাঠাইছে।

আমি তো আচার খাই না।

ও আল্লা, মহল আপা কইছে আপনে চাইছেন।

আরে না। খাই না যে জিনিস সেটা শুধু-শুধু চাইব কেন ?

কাজের মেয়েটি বাটি ফিরিয়ে নিয়ে গেল। আহসান খানিকটা বিরক্তই হলো। মহল মেয়েটির বুদ্ধি-শুদ্ধি সে-রকম নেই। বুদ্ধি যে কম তার আরেকটি প্রমাণ আছে। একবার নিউমার্কেটে দেখা। সে তার অন্য দুই বোনের সঙ্গে গিয়েছে। বোরকা নেই। তিন বোন হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। দৃশ্যটি অদ্ভুত। এত বড় বড় তিনটি মেয়ে হাত ধরাধরি করে হাঁটবে কেন ? আহসানকে দেখে তিনজন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। এটিও অস্বাভাবিক। মহল নিজেকে সামলে নিয়ে এগিয়ে এসে বলল, আমরা শাড়ি কিনতে এসেছি।

বেশ তো।

তিনজন একরকম শাড়ি কিনব।

ভালো।

আপনি একটু আসবেন আমাদের সঙ্গে ?

কেন ? আমাকে দরকার কেন ?

আপনি যেটা বলবেন সেটা কিনব।

তোমরা তোমাদের পছন্দমতো কিনবে। আমি বলব কেন ?

আপনি আসলে বেগম আপা কিছু বলবে না।

আরে না, তোমরা তোমাদের মার্কেটিং কর। আমি অন্য কাজে এসেছি।

মহল ফিরে গিয়ে আবার দু'বোনের হাত ধরল।

এদের তিন বোনের মধ্যে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে ওদের মধ্যে মিলের অংশটুকু। তিনজন দেখতে একরকম। একই রকম লম্বা। গলার স্বরও একধরনের। যতবার একসঙ্গে বাইরে যায় হাত ধরাধরি করে হাঁটে। মাঝখানে মহল, দু' পাশে দু' বোন।

বাবা মারা গেলে এরা বোধহয় একই রকম ভঙ্গিতে জড়াজড়ি করে কাঁদবে। এই চিন্তা মাথায় আসায় আহসানের একটু খারাপ লাগছে। একটি পরিবারের এত বড় দুঃসময়ে এমন কথা কী করে সে ভাবল ?

আহসানকে বেশ খানিকক্ষণ বসতে হলো। আগের সেই মহিলা এক পেয়ালা চা এবং পিরিচে করে দুধেভর্তি এক পিরিচ সেমাই দিয়ে গেলেন। সেমাইয়ের পিরিচে চামচ নেই। খেতে হলে বিড়ালের মতো চুক-চুক করে খেতে হবে।

একটু বসেন। বেগম আসতাছে।

ঠিক আছে, বসছি।

আমি বেগমের দূরসম্পর্কের ফুপু। বেগমের আব্বা আমার মামাতো ভাই।

ও আচ্ছা!

ভদ্রমহিলা বসলেন সামনের সোফায়। কৌতূহলী চোখে তাকে দেখতে লাগলেন। আহসান অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। রেবা মেয়েটিকে এরা কি যেতে দেখেছে? দেখাই স্বাভাবিক।

আপনের কথা মহলের কাছে শুনেছি।

কী শুনেছেন?

আপনের স্ত্রী মারা গেছে।

ঠিকই শুনেছেন।

একটা ছেলে আছে আপনের?

হ্যাঁ আছে।

কার সাথে থাকে?

ওর মামার বাড়িতে থাকে। ধানমণ্ডি।

মহল বলছে আপনি কোনোদিন ছেলেকে এই বাড়িতে আনেন নাই।

ছোট ছেলে। মাত্র চার বছর বয়স।

চার বছর ছোট হবে কেন? চার বছরের বাচ্চা তো অনেক বড়। তার নাম কী?

মারুফ।

সেমাইটা খান। সেমাই ভালো হইছে।

সেমাই খেতে ইচ্ছে করছে না।

আপনে খাওয়া-দাওয়া হোটেলে করেন?

একবেলা হোটেলে করি। একবেলা এখানে খাই।

মহল বলেছে আমাকে।

মহল দেখি অনেক খবর রাখে।

এই কথাটিতে ভদ্রমহিলা খানিকটা হকচকিয়ে গেলেন। আহসান বলল, আমার একটু বাইরে যেতে হবে। আমি পরে এসে খোঁজ নেব। ডাক্তাররা কী বলেছেন?

আর ডাক্তার! ডাক্তারের হাতে এখন নাই। এখন আল্লাহর হাতে।

বেগম এসে ঢুকল। তার দেরির কারণ বোঝা যাচ্ছে। সে গোসল করেছে। রাত জাগার ক্লান্তি তাতে দূর হয় নি। চোখ লাল হয়ে আছে। বেগমের হাতে একটি চামচ। চামচ নিয়েই সে নিশ্চয়ই আসে নি। পর্দার ফাঁক দিয়ে প্রথমে দেখে গিয়ে চামচ নিয়ে এসেছে।

বেগম বসল না।

আহসান বলল, করিম সাহেবের অবস্থা এখন কেমন?

আগের চেয়ে ভালো। শেষরাতে জ্ঞান হয়েছে। কথাটথা বলেছেন।

তাই নাকি!

জি।

আহসান বড়ই অবাক হলো। ভদ্রমহিলার কথার সঙ্গে এই মেয়ের কথার কোনো মিল নেই।

তোমার অন্য বোনেরা কি হাসপাতালে?

জি। আমি গেলে ওরা আসবে। ভাত খাওয়ার জন্যে আসবে।

তোমার মা? উনি কোথায়?

উনি হাসপাতালে।

আচ্ছা, আমি তাহলে উঠি এখন।

সেমাইটা খান।

সেমাই খেতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

একটু খান। ঘরে আর কিছু নাই।

আহসান বিস্মিত হয়ে তাকাল। মেয়েটির মধ্যে আগের সেই লজ্জা, সঙ্কোচ, কিছুই নেই। অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে কথা বলছে। বাবার অনুপস্থিতি নিশ্চয়ই এর একমাত্র কারণ নয়।

আহসান উঠতে-উঠতে বলল, আমি যাব একবার করিম সাহেবকে দেখতে।

আপনি গেলে বাবা খুব খুশি হবেন।

আহসান অবাক হয়ে বলল, তাই নাকি?

জি, খুব খুশি হবেন। বাবা আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।

আমার কথা কী জিজ্ঞেস করলেন?

জিজ্ঞেস করছিলেন আপনি অ্যাকসিডেন্টের খবর পেয়েছেন কি-না। মহলকে জিজ্ঞেস করছিলেন।

আচ্ছা!

আব্বা আপনাকে খুব ভালোমানুষ জানেন।

আহসানের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। মেয়েটি কি কিছু বোঝাতে চাচ্ছে ? বলতে চাচ্ছে— ভালোমানুষ হিসেবে জানলেও আপনি ভালোমানুষ নন। আপনার ঘর থেকে সুন্দর মতো, রোগা ফরসা একটি মেয়ে বের হয়েছে। সে রাত কাটিয়েছে আপনার সঙ্গে।

বেগমও তার দিকে তাকিয়ে আছে। সরল ও ক্লান্ত চোখ। না, এই মেয়ে কিছু দেখে নি। দেখলে চোখে তার ছায়া পড়ত। আহসান বলল, আমি যাব একবার।

আজ যাবেন ?

হ্যাঁ আজই। বিকেলে। ভিজিটিং আওয়ার্সে।

আহসান চলে যাবার জন্যে পা বাড়াল। বেগম ঠাণ্ডা গলায় বলল, আব্বা কোথায় আছেন তা তো আপনি জানেন না।

আহসানকে থমকে দাঁড়াতে হলো।

এই কাগজে ঠিকানাটা লেখা আছে।

বেগমের হাতে এক টুকরো কাগজ। সে তৈরি হয়েই এসেছে। মেয়েটি বুদ্ধিমতী। করিম সাহেব কি এই তথ্যটি জানেন ? বোধহয় জানেন না। আহসান হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল। মেয়েটি এতক্ষণ কাগজটি লুকিয়ে রেখেছিল। হয়তো ভেবেছে আহসান নিজেই চাইবে।

আচ্ছা এখন যাই ?

বেগম জবাব দিল না।

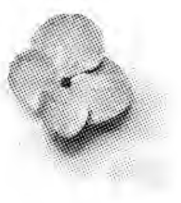

বাড়ির সামনে ট্রাক দাঁড়িয়ে। জলিল মিয়া বারান্দায় বসে আছে। তার হেলপার বালতি-বালতি পানি এনে ট্রাকের চাকায় ঢালছে। এই হেলপারটিকেই বোধহয় কুকুর কামড়েছে। বাঁ পায়ে পট্টি বাঁধা। সে কিছুক্ষণ পর-পর থুথু ফেলছে। আগেও ফেলত, নাকি কুকুর কামড়ানোর পর ফেলছে— কে জানে ! জলিল বলল, স্লামালিকুম প্রবেসর সাহেব।

ওয়ালাইকুম সালাম।

ঝামেলা দেখেন না, এই বিপদের মধ্যে ট্রিপে যাওয়া লাগবে। বগুড়া। পার্টির সাথে কথাবার্তা বলা। না গেলে হবে না।

ও!

হেলপার হারামজাদার শরীরটাও ভালো না। ইনজেকশন দেওয়া লাগবে। আপনি যান কোথায় ?

নিউমার্কেটের দিকে যাব।

একটু বসেন, ট্রাক নিয়া বার হব। নামায়ে দিব আপনারে।

না লাগবে না।

আমাদের দেরি হইত না।

কোনো দরকার নেই। শ্যামলীতে আমার একটা কাজ আছে।

ও আচ্ছা! যান তাহলে। স্লামালিকুম।

আহসান রাস্তায় নেমে পড়ল। রাস্তায় প্যাচপেচে কাদা। ইট বিছানো রাস্তা। জায়গায়-জায়গায় ইট উঠে গিয়ে গর্ত হয়েছে। পানি জমে আছে। সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশি মনোযোগ দিয়ে সে রাস্তা দেখছে। মনে-মনে সে কিছু একটা খুঁজছে। যা খুঁজছে তা সে পেয়ে গেল।

রাস্তার একপাশে ঘাসের উপর এক পাটি স্যান্ডেল। রেবা কিংবা পারুল নামের মেয়েটির স্যান্ডেল। যাবার সময় বোধহয় বেচারির চোখে পড়ে নি। লাল

ফিতার নতুন স্যান্ডেল, হয়তো অল্প কিছুদিন হলো কিনেছে। আহসান লক্ষ করল তার মন খারাপ লাগছে। অথচ মন খারাপ হবার মতো কিছুই হয় নি। এই মেয়েটিকে এক রাতের জন্যে সে আশ্রয় দিয়েছিল। রাত কেটে গেছে, সে চলে গেছে— ব্যস, ফুরিয়ে গেল। কিন্তু এখন এমন লাগছে কেন? শুধু যে এখন এমন লাগছে তাই না, ভোরবেলা ঘুম ভেঙে যখন দেখেছে মেয়েটি চলে গিয়েছে তখনি বুকে আচমকা একটা ধাক্কা লেগেছিল। যা সে প্রাণপণে অস্বীকার করেছে। কিন্তু কেন? এরকম হচ্ছে কেন? আহসান একটি সিগারেট ধরাল। কার্যকারণ ছাড়া এই পৃথিবীতে কিছুই হয় না। সে কি কার্যকারণ ছাড়াই একপাটি স্যান্ডেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে? নিশ্চয়ই না। কারণ একটি আছে, যা স্বীকার করতে তার ইচ্ছে করছে না। রেবা বা পারুল নামের মেয়েটির সঙ্গে তারিনের চেহারার খুব মিল। প্রথম দিকে চোখে পড়ে নি কিন্তু মেয়েটি যখন তারিনের শাড়ি পরে বেরুল তখন আহসানের গা কাঁপছিল। কী অদ্ভুত মিল! কী অসম্ভব ব্যাপার! তখন তা সে স্বীকার করে নি। রূঢ় ব্যবহারই করেছে মেয়েটির সঙ্গে। খেতে বলেছে অবশ্যি। সেই বলায় মমতা বা করুণা ছিল না। কিংবা থাকলেও তার প্রকাশ হয় নি। প্রকাশ হলে ক্ষতি ছিল না কিছু।

কড়া রোদ উঠেছে। আহসান হাঁটছে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। তার তেমন কোনো পরিকল্পনা নেই। কোনো একটা হোটেলে দুপুরের খাবার খেতে হবে। এই পর্যন্ত। বিকেলের জন্যে আরেকটা ঝামেলা বেধে রয়েছে। হাসপাতালে যেতে হবে।

শ্যামলী থেকে সে একটা বাসে উঠল। প্রায় ফাঁকা বাস। বাসে চড়লেই তার কেমন ঝিমুনির মতো আসে। আজ আসছে না। এত খালি সিট থাকতেও নোংরা এক বুড়ো এসে বসল তার পাশে। বুড়োর হাতে পলিথিনের ব্যাগে কিছু ছোট মাছ। বিকট গন্ধ আসছে সেখান থেকে। হঠাৎ করেই আহসানের মনে হলো পলিথিনের একটা ব্যাগ থাকলে স্যান্ডেলটা নিয়ে আসা যেত। কোনোদিন এ-মেয়েটির সঙ্গে দেখা হলে ফিরিয়ে দেওয়া যেত। সে নিশ্চয়ই অন্য পাটিটি যত্ন করে রেখেছে।

বুড়োর পলিথিনের ব্যাগ থেকে টপ-টপ করে মাছের রস পড়ছে। এক ফোঁটা পড়ল আহসানের প্যান্টে। উঠে অন্য কোথাও বসা উচিত কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছে না।

দরজা খুলে জেরিন বিরক্ত গলায় বলল, দুলাভাই, আপনি সব সময় অড আওয়ারে আসেন কেন? ছুটির দিনে আড়াইটার সময় কেউ আসে?

আহসান হাসল।

আসুন, ভেতরে আসুন। কাঁচাঘুম ভাঙিয়েছেন, ভীষণ রাগ লাগছে।

সরি। বাসায় আর কেউ নেই?

বাবা আছেন। ঘুমুচ্ছেন। মা আপনার পুত্রকে নিয়ে মেজপা'র বাসায়। আপনি খেয়ে এসেছেন নিশ্চয়ই?

হুঁ।

জেরিন হাই তুলে বলল, চোখটা শুধু লেগে এসেছে এমন সময় কলিং বেল টিপলেন। এরকম অসময়ে ফকির-মিসকিনরা এসে কলিং বেল টিপে ভিক্ষা চায়। বুঝলেন সাহেব?

বুঝলাম।

কাঁচা ঘুম ভাঙলে কী যে খারাপ লাগে!

দুপুরে ঘুমের অভ্যাসটা বাদ দাও। হু-হু করে মোটা হয়ে যাবে। পাত্র জুটবে না।

চা খাবেন? চা করতে হবে?

না, হবে না। ফ্রিজে ঠাণ্ডা কিছু আছে?

পানি আছে। পানি দিতে পারি।

তা-ই দাও।

জেরিন পানি আনল, সঙ্গে একগ্লাস শরবত। দু'টি হিমশীতল সন্দেশ এবং এক টুকরো কেক।

ফ্রিজে যা পেয়েছি নিয়ে এসেছি। কেকটা বাসি। ওটা খাবেন না।

বাসি তো আনলে কেন ?

প্লেটের শোভা বাড়াবার জন্যে। দুলাভাই, শরবত-টরবত খেয়ে রেস্ট নিন। আমি ঘুমোতে চললাম। সন্ধ্যাবেলা দেখা হবে।

সত্যি-সত্যি যাচ্ছ নাকি ?

হ্যাঁ সত্যি-সত্যি যাচ্ছি। আপনার উপর দু'টি দায়িত্ব— কেউ কলিং বেল টিপলে দরজা খুলবেন। টেলিফোন এলে ধরবেন এবং বলবেন— বাসায় কেউ নেই, সন্ধ্যার পর ফোন করুন।

আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যাও।

রেস্ট নিতে চাইলে রেস্ট নিতে পারেন— বিছানা দেখিয়ে দিচ্ছি। আর যদি জেগে থাকতে চান কিছু ম্যাগাজিন-ট্যাগাজিন দিতে পারি। Omni বলে একটা চমৎকার ম্যাগাজিন আছে। সায়েন্স ফিকশান ম্যাগাজিন।

কিছু লাগবে না।

বসে-বসে ধ্যান করবেন ?

ঝিমুব। ঝিমুতে ইচ্ছে করছে। তুমি যাও, তোমাকে বসে থাকতে হবে না।

জেরিন গেল না। কোলের উপর দু' হাত রেখে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে রইল। জেরিনের সঙ্গে তারিনের কোনো মিল নেই। দু'জন সম্পূর্ণ দু'রকম। তবুও এরা দু'জন যে বোন তা যে-কেউ ধরতে পারবে। অতি সূক্ষ্ম সাদৃশ্য। তা-ও বা কী করে হয়, সূক্ষ্ম সাদৃশ্য হলে চট করে এরা যে দু' বোন তা বলা যায় কী করে ? জেরিনের মধ্যে এক ধরনের কাঠিন্য আছে। সে খানিকটা অহঙ্কারী। অহঙ্কার তার চরিত্রের সঙ্গে মানিয়ে গেছে। চার ভাইবোনের মধ্যে জেরিন সবচেয়ে মেধাবী। মেট্রিক থেকে শুরু করে অনার্স পর্যন্ত চোখ-ধাঁধানো রেজাল্ট করেছে। অনার্স প্রথম নিয়েছিল জিওগ্রাফিতে। সেটা বদলে নিয়েছে স্ট্যাটিসটিক্স। তা-ও নাকি কার উপর রাগ করে। শুধুমাত্র দেখানোর জন্যে অঙ্কে মেয়েদের মাথা পুরুষদের চেয়ে খারাপ নয়। তা সে দেখিয়েছে।

কী ব্যাপার জেরিন, ঘুমোতে যাচ্ছ না যে ?

যাব, খানিকটা ভদ্রতা করে নিই। আফটার অল বড় বোনের হাসব্যান্ড, অভদ্রতা করি কীভাবে ? এ-বাড়ির জামাই।

জেরিন অল্প-অল্প পা দুলাচ্ছে। কাঠিন্য ও স্নিগ্ধতা মেশানো একটা মুখ দেখতে ভালো লাগে। আহসান বলল, মারুফ আছে কেমন ?

ভালো আছে বলেই তো মনে হয়। অবশ্যি আমি ঠিক বলতে পারব না। মা বলতে পারবেন। ওর দেখাশোনা মা করেন। আমার এত সময় নেই।

পড়াশোনা ?

হুঁ। তাছাড়া আপনার পুত্র আমাকে দেখতে পারে না। ঐদিন ভুলিয়ে-ভালিয়ে আমার কাছে এনে শুইয়েছি। মাঝরাতে একা-একা বালিশ নিয়ে উঠে চলে গেছে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। আমিও ছাড়বার পাত্র না। আমি আবার তুলে নিয়ে এলাম। আবার ঘুম ভেঙে একা-একা চলে গেল।

তুমি কী করলে ? আবার নিয়ে এলে ?

ঠিক ধরেছেন। অন্য কেউ হলে এটা করত না, হাল ছেড়ে দিত। আমি এত সহজে হাল ছাড়ি না।

খুব ভালো গুণ।

ভালো মন্দ জানি না। আমি যে-রকম সে-রকম। সব মানুষই আলাদা। আপা ছিল আপার মতো। আমি হয়েছি আমার মতো।

ফিলসফি করছ ?

ফিলসফি-টফি না। আমি এইসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আজকাল ভাবি।

প্রেমে-ট্রেমে পড়লে মেয়েরা এইসব ভাবে। ঘটেছে সে-রকম কিছু ?

না। সবাই কি আর আপা ?

আহসান তাকাল তীক্ষ্ণ চোখে। জেরিন তার আপার প্রেমের প্রসঙ্গটি অত্যন্ত কঠিনভাবে মাঝেমধ্যে আনে। মনে হয় কোনো বিচিত্র কারণে এই বিষয়টি নিয়েই তারিনের উপর তার চাপা রাগ আছে। যে-মেয়েটি বেঁচে নেই তার উপর এতটা রাগ এখনো থাকা খুব অন্যায়।

দুলাভাই!

বলো।

আমার মাঝে-মাঝে জানতে ইচ্ছে করে আপনাকে আপা এতটা পছন্দ করেছিল কেন ? ভালো লাগার মতো সত্যি কি কিছু আছে আপনার মধ্যে ?

না নেই।

আসলেই কিন্তু নেই। প্রাইভেট কলেজে মাস্টারি করেন। হেন-তেন করে একটা সেকেন্ড ক্লাস পেলেই প্রাইভেট কলেজের মাস্টারি যোগাড় করা যায়। যায় না ?

হ্যাঁ যায়।

আপনার চেহারা ভালো না। গান জানেন না, খেলাধুলা জানেন না। দরিদ্র পরিবারের ছেলে। ভুল বলছি ?

না।

কী দিয়ে আপাকে ভুলিয়েছিলেন ? কাইন্ডলি একটু বলুন শুনি। আমি প্রায়ই ভাবি আপনাকে জিজ্ঞেস করব। জিজ্ঞেস করা হয় না। মনে থাকে না।

আহসান সিগারেট ধরাল। এক টুকরো সন্দেশ ভেঙে মুখে দিল। জেরিন নিচু গলায় বলতে লাগল, বড় আপা এবং আমি এক খাটে ঘুমুতাম। বুঝলেন দুলাভাই, আপনি সেই সময় বড় বড় চিঠি লিখতেন আপাকে। আমি ঘুমিয়ে পড়তেই আপা অসংখ্যবার পড়া চিঠি আবার পড়তে বসত।

বুঝতে কী করে ? তুমি তো ঘুমে।

না, ঘুমে না। ঘুমের ভান। আপা সেই সব আজেবাজে চিঠি পড়ে খুব কাঁদত। এমন রাগ লাগত আমার!

আজেবাজে বলছ কেন ?

আজেবাজে বলছি কারণ ঐসব চিঠি আমি লুকিয়ে পড়েছি। নিতান্তই হালকা কথাবার্তা। বানানো সব ব্যাপার। আমি খুব নিশ্চিত ছিলাম বিয়ের পর-পর আপা একটা শক খাবে। দেখবে এইসব প্রেম-ট্রেমের ব্যাপারগুলো সত্যি না।

তোমার কি মনে হয়— শক খেয়েছিল ?

না, বিয়ের পর আপা আরো অন্যরকম হয়ে গেল। যেন পৃথিবীতে আপনি ছাড়া দ্বিতীয় মানুষ নেই। আমি ভীষণ আহত হয়েছিলাম।

পাস্ট টেন্সে কথা বলছ, তার মানে কি এই যে এখন আহত হচ্ছ না ?

এখনো হচ্ছি। হচ্ছি বলেই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। কী দিয়ে তাকে ভুলিয়েছিলেন ?

কিছু দিয়েই তাকে ভুলাই নি। সে ভুলেছে নিজ গুণে।

আমারও তাই মনে হয়। আপা আপনাকে বিয়ে না করে যদি অন্য কাউকে বিয়ে করত তাহলেও একই অবস্থাই হতো। তার চিন্তা-চেতনা জুড়ে থাকত ঐ লোকটি।

সেটা কি খুব খারাপ ?

হ্যাঁ খারাপ। প্রতিটি মানুষের নিজস্ব আইডেনটিটি থাকবে। মেয়ে মানেই কি লতানো গাছ ? যে অন্য কাউকে না জড়িয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না ?

পারবে না কেন, নিশ্চয়ই পারবে। তুমি যে অন্তত পারবে এই সম্পর্কে আমি নিশ্চিত।

ঠাট্টা করছেন ?

না, ঠাট্টা করছি না। তুমি খুবই স্পিরিটেড মেয়ে। তোমার এই স্পিরিট দেখতে ভালো লাগে।

আর আপার কোন জিনিসটা দেখতে ভালো লাগত ?

আহসান উত্তর দিল না। জেরিন বলল, বলুন না শুনি। আচ্ছা ঠিক আছে, উল্টোটা বলুন— আপার কোন জিনিসটা আপনার খারাপ লাগত ?

ঐ প্রসঙ্গ থাক। অন্য কিছু নিয়ে আলাপ করি শোন। তোমার ঘুমের কী হলো ?

জেরিন জবাব দিল না। কী যেন সে ভাবছে। তার কপাল কুঁচকানো, মুখের ভাব চিন্তাক্লিষ্ট। গরমে নাক ঘেমেছে। সুন্দর লাগছে দেখতে। তারিনেরও নাক ঘামত।

দুলাভাই।

বলো।

আপনার সঙ্গে আমার একটি অত্যন্ত জরুরি কথা আছে।

এতক্ষণ যা বললে সেগুলো জরুরি নয় ?

না নয়।

বেশ, বলো শুনি।

বলছি— কিন্তু আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমার জরুরি কথাটা বলা শেষ হবার পরেও আগে যেভাবে আসতেন এ-বাড়িতে ঠিক এইভাবেই আসবেন।

আহসান হাসিমুখে বলল, বেশ নাটকীয় ওপেনিং। ব্যাপার কী বলো তো ?

আপনার বাবা, আমার বাবাকে একটি চিঠি দিয়েছেন। সেই চিঠি পড়ে বাসার সবাই খুব মন খারাপ করেছে। সবচেয়ে বেশি মন খারাপ করেছি আমি। আপনি বোধহয় জানেন না আমি কোনোদিন কাঁদি না, কিন্তু সেই চিঠি পড়ে খুব কেঁদেছি। কেঁদেছি কারণ আমার ধারণা ঐ চিঠি আপনি আপনার বাবাকে দিয়ে লিখিয়েছেন। আপনার বাবা, সরি আমার বোধহয় তালই সাহেব বলা উচিত— নিজ থেকে এরকম একটা চিঠি লিখতে পারেন না।

চিঠিটা দেখি।

জেরিন ড্রয়ার থেকে চিঠি বের করল, আহসানের হাতে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আহসানের অনেক সময় লাগল চিঠি শেষ করতে। তার বাবা

কুতুবপুর এম ই হাইস্কুলের অ্যাসিসটেন্ট হেডমাস্টার জনাব নেছারউদ্দিন অত্যন্ত প্যাঁচলো অক্ষরে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন—

ইয়া রব

প্রিয় বেয়াই সাহেব,

আসসালামু আলায়কুম। পর সমাচার এই যে, দীর্ঘদিন আপনার সঙ্গে পত্র মারফত কোনো যোগাযোগ নাই। গত রমজানে আপনাকে একটি পত্র দিয়াছিলাম, সম্ভবত আপনার হস্তগত হয় নাই।

যাই হোক, একটি বিশেষ আবদার নিয়া আপনার নিকট এই পত্র প্রেরণ করিতেছি। আবদারটি আপনার তৃতীয় কন্যা জেরিন প্রসঙ্গে। এই অত্যন্ত সুলক্ষণা, বিদ্যাবতী ও গুণবতী কন্যাটির সঙ্গে আহসানের বিবাহ কি হইতে পারে না ? যদি হয় তাহা হইলে মারুফ সম্পর্কে আমাদের সকলের সকল আশঙ্কা দূর হয়। সৎ মা'র গৃহে শিশুদের কী অবস্থা হয় তা তো আপনার অজানা নাই। আমি নিজেও ভুক্তভোগী। মা জেরিনের সঙ্গে আহসানের বিবাহ দিতে পারিলে সব দিক নিশ্চিত হওয়া যায়। পত্র মারফত এইসব বিষয় আলোচনা করা সম্ভব না। বাধ্য হইয়া করিলাম। কারণ আমি বর্তমানে বাতব্যাধিতে শয্যাশায়ী। হাঁটাচলার সামর্থ্য নাই।

আপনি এই পত্রটি বেয়ান সাহেবকে দেখাইবেন। এবং তাঁহার সহিতও পরামর্শ করিবেন।

এই হচ্ছে চিঠি শুরুর প্রস্তাবনা। এরপরও নানান প্রসঙ্গ আছে। তাঁর অসুখের পূর্ণ বিবরণ আছে। কুতুবপুর এম ই স্কুল নিয়ে বর্তমানে যে পলিটিক্স চলছে এবং এই পলিটিক্সের ফলে যে স্কুলের অস্তিত্বই বিপন্ন হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তার বিশদ বিবরণ আছে। এই অবস্থায় কী করা উচিত বলে বেয়াই সাহেব মনে করেন ?... এইসবও আছে।

আহসান চিঠিটি খামে ভরে টেবিলের উপর রাখল। জেরিন চা নিয়ে ঢুকছে। শান্ত ভঙ্গিতে টি-পট থেকে চা ঢালছে।

দুলাভাই, মা ফিরেছে। আমাকে বলেছে আপনাকে যেন চলে যেতে না দিই। মা নামাজ পড়েই আসবে। চায়ে চিনি হয়েছে ?

হ্যাঁ হয়েছে।

এখন আপনাকে আরেক কাপ চা খেতে হবে বাবার সঙ্গে। তিনি চা-নাশতা নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

তাহলে আর এখানে চা দিলে কেন ?

আপনি সিগারেট ছাড়া চা খেতে পারেন না এই জন্যে।

জেরিন হাসল। হাসতে-হাসতে বলল, আজ রাতে তো আপনি থাকবেন এখানে, তাই না ?

তেমন কোনো কথা ছিল কি ?

না, ছিল না। কিন্তু আমি জানতাম আজ আপনি আসবেন এবং রাতে থেকে যাবেন। আমি মাকে সকালবেলাতেই বলে রেখেছি ভালোমতো বাজার করতে।

আজ কি কোনো বিশেষ দিন ?

জেরিন তীব্র গলায় বলল, কেন প্রিটেন্ড করছেন ? আপনি ভালোই জানেন আজ কোন দিন। জানেন বলেই এসেছেন। গত দু' মাসে কি একবারও এসেছেন এ-বাড়িতে ?

আহসানের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আজ এগারই শ্রাবণ। এই দিনে পাঁচ বছর আগে তারিনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। বাসর হয়েছিল এ-বাড়িতেই। খুব ঝড়-বৃষ্টির রাত ছিল বলে বর-কনেকে যেতে দেওয়া হয় নি।

জেরিন ঠাণ্ডা গলায় বলল, যান, বাবা বসে আছে। দেখা করে আসুন।

আহসানের শ্বশুর ইমতিয়াজ সাহেব ঠাণ্ডা ধরনের মানুষ। কোনো কিছুতেই উত্তেজিত না হওয়ার অসাধারণ গুণটি তিনি আয়ত্ত করেছেন। সারাজীবন জজিয়তি করে-করে কথা না বলে শুধু শুনে যাওয়ার বিষয়টিও তাঁর মজ্জাগত হয়েছে। অসম্ভব ভদ্রলোক। নিজের জামাইয়ের সঙ্গে কথা বলার সময়ও খুব লক্ষ রাখেন যেন কোথাও সৌজন্য এবং শিষ্টতা ক্ষুণ্ন না হয়।

আহসানকে তিনি কখনো সহজভাবে নিতে পারেন নি। অবশ্যি তা বুঝতেও দেন নি। তবে এইসব ব্যাপার বোঝা যায়। আহসানের বুঝতে অসুবিধা হয় নি। নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিকভাবে একবার সে তারিনকে বলেও ফেলল, তোমার বাবা আমাকে সহ্য করতে পারে না কেন বলো তো ?

তারিন খুবই স্বাভাবিকভাবে বলল, সবাই কি আর সবাইকে সহ্য করতে পারে ? এমন যে মহাত্মা গান্ধী তাঁকেও তো অনেকে সহ্য করতে পারত না।

মহাত্মা গান্ধী অনেক বড় ব্যাপার। এইসব তুচ্ছ ব্যাপারে তাঁর কিছু যায় আসে না। আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আমার খারাপ লাগে।

আমারও লাগে, কিন্তু কী আর করা।

না, করার কিছুই নেই। মেনে নেওয়া ছাড়া আর কী পথ আছে ? আহসান মেনে নিয়েছিল। এ-বাড়িতে পা দিলে সে নিয়মমাফিক কিছু সময় কাটাত ইমতিয়াজ সাহেবের সঙ্গে। ইমতিয়াজ সাহেব ন্যাশনাল জিওগ্রাফির পাতা বন্ধ করে অতি ভদ্র স্বরে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে এক সময় ইতি টানতেন। সেই ইতি টানার ব্যাপারটিও রুচিসম্মত।

যাও, তোমাকে আর আটকে রাখতে চাচ্ছি না। বুড়ো মানুষদের সঙ্গে বেশি সময় কাটানো ভালো নয়— এতে মনের মধ্যে বুড়ো-বুড়ো ভাব ঢুকে যায়। যা মোটেই ডিজায়ারেবল নয়।

আহসান পাশের কামরায় ঢুকল। শ্বশুরের সঙ্গে তার কথাবার্তা হলো মামুলি ধরনের। সে এদিকে তেমন আসে না কেন ? ছেলেটি এখানে আছে সে-কারণেও তো আসা উচিত। এবং ছেলেটিকে নিজের কাছে মাঝেমধ্যে রাখা উচিত।

কি বলো আহসান, উচিত না ?

একটু বড় হোক। তারপর মাঝেমধ্যে নিয়ে রাখব। এখন নিলে কাঁদবে।

কাঁদবে কেন ? বাবার কাছে কি ছেলে কাঁদে ? মোটেই কাঁদে না।

মোটেই কাঁদে না কথাটা ঠিক না। আহসানের শাশুড়ি মারুফকে কোলে নিয়ে বারান্দায় আসতেই মারুফ তার বাবার দিকে তাকিয়ে কাঁদতে শুরু করল। সে এখানে আসবে না।

তোমাকে না দেখে-দেখে এরকম হয়েছে।

আহসান কিছু বলল না। তার শাশুড়ি ছেলেকে তার কোলে দিতে চেষ্টা করতে লাগলেন। ছেলে কিছুতেই আসবে না। হাত-পা ছুড়ছে।

আহসান খানিকটা অপ্রস্তুত বোধ করছে। সে ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, কী রে ভালো ?

মারুফ পাথরের মতো মুখ করে রইল। আহসানের শাশুড়ি বললেন, খোকন, তোমার পেঙ্গুইনের খেলনাটা বাপিকে দেখাবে না ?

না।

দেখতে চাচ্ছে যে। আহসান, তুমি পেঙ্গুইনের খেলনা দেখতে চাও। তাই না ?

হ্যাঁ চাই।

খেলনাটা দেখার জন্য তোমার খুব লোভ হচ্ছে, তাই না ?

হ্যাঁ হচ্ছে।

এই জাতীয় কথাবার্তা দীর্ঘ সময় চালিয়ে যাওয়া খুবই বিরক্তির ব্যাপার। শাশুড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে আহসান চালিয়ে যায়। মারুফের মুখের কাঠিন্য তাতে বিন্দুমাত্র কমে না। এতে আহসানের শাশুড়ি বেশ আনন্দ পান। আহসানের ধারণা ছেলে যদি কোনো দিন তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে মনের কষ্টে তার শাশুড়ির হার্ট অ্যাটাক হবে।

আহসান বলল, এখন উঠব, আমাকে একটু হাসপাতালে যেতে হবে, একজনকে দেখতে যাওয়ার কথা।

তার শাশুড়ি অবাক হয়ে বললেন, তা কী করে হয় ? আজ রাতে তো তুমি এখানে থাকবে। জেরিন তোমার জন্যে সকালবেলা বাজার করিয়েছে। রান্নাবান্না হচ্ছে।

আমাকে যেতেই হবে। আমার চেনা একজন মানুষ অ্যাকসিডেন্ট করেছে। হয়তো মারা যাবে।

আহসানের কথাগুলো খুব বিশ্বাসযোগ্য হলো না। মনে হলো সে বানিয়ে-বানিয়ে একটা অজুহাত তৈরি করছে। তা-ও খুব জোরালো অজুহাত নয়।

তার শ্বশুর গম্ভীর গলায় বললেন, ঠিক আছে, তুমি হাসপাতালে যাও, ভদ্রলোককে দেখে চলে আস। সেখানে নিশ্চয়ই তোমাকে সারারাত থাকতে হবে না।

না, তা হবে না।

ভদ্রলোক কে ?

আমার বাড়িওয়ালা করিম সাহেব।

অসুখটা কী ?

টেম্পোর সঙ্গে অ্যাকসিডেন্ট করেছেন।

ও আচ্ছা, যাও। চা খেয়ে যাও। চা ঠাণ্ডা হচ্ছে।

ভদ্রলোক একটা চুরুট ধরিয়ে খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, তোমার বাবার শরীর কেমন ? চিঠিপত্র পাও ?

পাই। শরীর ভালোই সম্ভবত।

আমি অবশ্যি রিসেন্টলি একটি চিঠি পেয়েছি, তাতে বাতে কষ্ট পাচ্ছেন বলে লিখেছেন। স্কুলেও কী সব ঝামেলা হচ্ছে।

আহসান অপেক্ষা করতে লাগল কখন জেরিনের প্রসঙ্গটি আসে। মনে হচ্ছে আসবে। না এলে চিঠির প্রসঙ্গ উনি আনতেন না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, প্রসঙ্গ উঠল না। উনি বর্ষার কথা নিয়ে এলেন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে উনি জেরিনের

প্রসঙ্গটি এনে ব্যাপারটা এখানেই মিটিয়ে দিতে চান। কিন্তু চক্ষুলজ্জায় আনতে পারছেন না। আহসান বলল, আপনার সঙ্গে আমি একটি ব্যাপারে আলাপ করতে চাচ্ছিলাম।

কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিছু কি ?

না, তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না।

তোমার শাশুড়িকেও ডাকি। ও বোধহয় মারুফকে দুধ খাওয়াতে গেছে।

না, ওনাকে ডাকার প্রয়োজন নেই। করিম সাহেবের কথা বলছিলাম না আপনাকে— আমার বাড়িওয়ালা।

হ্যাঁ বলছিলে।

ভদ্রলোকের খুব ইচ্ছা তাঁর মেয়েকে আমি বিয়ে করি। আমিও ভাবছিলাম...

গুড ভেরি গুড। মেয়ে তোমার পছন্দ হলে অফকোর্স করবে। তোমার সারা জীবন তো সামনেই পড়ে আছে। ইয়াংম্যান...

আহসানের মনে হলো তাঁর শ্বশুরের বুক থেকে পাষাণ ভার নেমে গেছে। তিনি খুব হালকা বোধ করছেন। চট করে চমৎকার একটি মিথ্যা মাথায় আসায় ভালোই হয়েছে। ঐ চিঠির প্রসঙ্গ তিনি আর তুলবেন না।

আমি এখন উঠি ?

ঘণ্টাখানিকের মধ্যে চলে আসবে কিন্তু। খাবে এখানে।

ঠিক আছে।

এক কাজ কর না কেন ? গাড়ি নিয়ে যাও। ড্রাইভার আছে।

না, গাড়ি লাগবে না। মেডিক্যাল কলেজে যাব। কতক্ষণ থাকব কিছু ঠিক নেই।

আহসান উঠে দাঁড়াল।

বেশি দেরি করবে না। এদিকে রেগুলার ছিনতাই-টিনতাই হচ্ছে। দেশে বাস করা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে।

না, দেরি করব না।

আহসানের শ্বশুর তাঁর সঙ্গে গেট পর্যন্ত এলেন। একবারও জিজ্ঞেস করলেন না— করিম সাহেবের মেয়েটি কী পড়ে। দেখতে কেমন ? এই অসম্ভব ভদ্র, সংস্কৃতিবান পরিবারটির কেউই তার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখায় না। একজন ছাড়া। সেই একজন তারিন। আহসান ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল।

ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে গেছে বলেই বোধহয় ভিজিটারদের সংখ্যা অনেক বেশি। গিজ-গিজ করছে চারদিকে। ফিনাইলের কড়া গন্ধ, ওষুধের গন্ধ এবং রোগের গন্ধ। কিছুক্ষণ থাকলেই মাথা ভার-ভার হয়ে যায়। বমি-বমি লাগে। তবু যদি কেউ বেশিক্ষণ থাকে তাহলে যেতে চায় না। এইসব গন্ধের কোনো একটিতে সম্ভবত অ্যাডিকশনের কিছু আছে। যা মানুষকে আটকে ফেলে। ভাবতে-ভাবতে আহসান এলোমেলোভাবে খানিকক্ষণ করিডোর দিয়ে হাঁটল। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে করিডোর পরিচ্ছন্ন। এত মানুষজন যাওয়া আসার মধ্যেও করিডোর পরিচ্ছন্ন আছে কীভাবে তা-ও একটা রহস্য।

বুড়োমতো একজন হাতে এক ডজন কলা নিয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে এ-মাথা ও-মাথা করছে। সে আহসানের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ডাক্তার সাব, চইদ্দ নম্বর কোনখানে ?

হাসপাতালের কাউকে জিজ্ঞেস করুন। আমিও একজনকে খুঁজছি।

বুড়ো আসতে লাগল তার সঙ্গে-সঙ্গে। ডাক্তারদের চেহারা কি অন্যদের থেকে আলাদা ? তারিন হাসপাতালে থাকার সময়ও কয়েকবার অপরিচিত লোকজন তাকে ডাক্তার ভেবেছে। হাসপাতালের ডাক্তাররা অসম্ভব গম্ভীর থাকেন। অস্বাভাবিক একটি কাঠিন্য তাঁদের চোখে-মুখে মাখানো থাকে, তারও কি তাই ?

বুড়ো লোকটি গভীর আগ্রহে তাকে লক্ষ করছে। তার কলার কাঁদি থেকে একটি কলা ছিঁড়ে পড়ে গেছে। সেই কলাটি সে অন্য হাতে ধরে আছে। সে ভেবে পাচ্ছে না— ডাক্তারের মতো এই লোকটি একবার সিঁড়ির এই মাথায় যাচ্ছে, একবার অন্য মাথায় যাচ্ছে কেন। সে ভয়ে-ভয়ে ডাকল, ডাক্তার সাব!

আমি ডাক্তার না। আপনাকে তো আগে একবার বলেছি। আর শুনুন, আপনি আমার পিছনে পিছনে হাঁটছেন কেন ?

বুড়ো লোকটির কলার কাঁদি থেকে আরো একটি কলা ছিঁড়ে পড়ে গেল। সে কলাটি কুড়িয়ে ভয় পাওয়া ভঙ্গিতে দূরে সরে গেল। বড় মায়া লাগল আহসানের। মায়া ব্যাপারটি বেশ অদ্ভুত। হঠাৎ তেমন কোনো কারণ ছাড়াই কঠিন হৃদয় মানুষের মধ্যে এটা জেগে উঠে তাকে অভিভূত করে দেয়। তারিনের সঙ্গে পরিচয়ের সময়ও ঐ মায়া নামক ব্যাপারটি কাজ করেছে।

সেই বিকেলে তার কিছু করার ছিল না। কিছু করার না থাকলে শুধু হাঁটতে ইচ্ছে করে। সে প্রায় সারা বিকেল হেঁটে ক্লান্ত হয়ে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দিকে এলো। ভ্যাপসা গরম। গায়ে ঘাম চট-চট করছে। অসম্ভব তৃষ্ণা পেয়েছে। বার-বার মনে হচ্ছে শহরের জায়গায়-জায়গায় হাইড্রেন্ট থাকলে বেশ হতো। তৃষ্ণার্ত ক্লান্ত পথচারী হাইড্রেন্ট খুলে চোখে-মুখে পানি দিত, আঁজলা ভর্তি পানি পান করত।

বাংলা একাডেমিতে কী একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। রবীন্দ্র বা নজরুল এই দু'জনের কোনো জয়ন্তী-টয়ন্তী হবে। হয়তো এই গরমে অনুষ্ঠান ঠিক জমছে না। যত লোক যাচ্ছে তার চেয়ে বেশি বেরিয়ে আসছে। আইসক্রিমওয়ালারা ঘণ্টা বাজিয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কামড়ে-কামড়ে আইসক্রিম খাবার মতো বাজে জিনিস আর কিছুই নেই। তবু আহসান একটি আইসক্রিম কিনল, আর ঠিক তখন ছ'সাত বছরের টোকাই শ্রেণীর একটি বালিকা তার ভাইকে কোলে নিয়ে আহসানের পাশে এসে দাঁড়াল। কড়া একটা ধমক দিতে গিয়েও ধমক দেওয়া গেল না। বালিকার চোখ দু'টি অসম্ভব কোমল। আহসান আইসক্রিমওয়ালাকে বলল, এদের দু'জনাকে দু'টি আইসক্রিম দাও।

কত দামের ?

আমারটা যেমন সে-রকম। আমারটার দাম কত ?

আট টাকা।

আট টাকা! বলো কী ? আইসক্রিমের এত দাম নাকি ?

চকবারের দাম বেশি।

দাও, ওদের তাই দাও।

আইসক্রিমওয়ালা গম্ভীর মুখে দু'টি আইসক্রিম বের করল। তখন গুটি-গুটি আর একটি বালক এসে উপস্থিত। কোমল চোখের মেয়েটি বলল, এ আমার ভাই।

দাও, এর ভাইকেও একটা দাও।

আইসক্রিমওয়ালা বিরক্ত গলায় বলল, অত দিয়া পার পাইতেন না— দুনিয়ার ফকির আইয়া বেড় দিব।

বাচ্চা তিনটি গভীর আগ্রহে আইসক্রিম খাচ্ছে। ছোট ছোট টুকরো ভেঙে মুখে দিচ্ছে। আহসান বলল, কী-রে তোদের নাম কী ? বড় মেয়েটি হেসে ফেলল। যেন এমন অদ্ভুত কথা এই জন্মে শোনে নি। তাকে হাসতে দেখে অন্য দু'জনও হাসতে লাগল।

হাসছিস কেন রে শুধু-শুধু ?

এতে তাদের হাসি আরো বেড়ে গেল। আহসান লক্ষ করল শুধু এরাই হাসছে না। হাসিমুখে আর একজন তাকিয়ে আছে তার দিকে। লম্বা, রোগা একটি মেয়ে। বালিকাদের মতো স্নিগ্ধ মুখ। অনেকদিনের চেনা মেয়ের মতো সে বলল, এদের সঙ্গে আপনার দেখি খুব ভাব হয়ে গেছে।

আহসান কী বলবে ভেবে পেল না। মেয়েটি হাসিমুখে বলল, আপনি কি প্রায়ই এরকম করেন ?

না।

আমার নাম তারিন, আমার বান্ধবীর আজ এখানে গান গাওয়ার কথা। সে আসে নি। কী কাণ্ড দেখুন না। অথচ আমি তার জন্যেই এসেছি।

কত সহজ কত স্পষ্ট ভঙ্গিতে কথা বলছে মেয়েটি। কোনো রকম জড়তা নেই, দ্বিধা নেই।

আহসান খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, আপনিও কি আমাদের সঙ্গে একটা আইসক্রিম খাবেন ? মেয়েটি হাসতে-হাসতে বলল, জি-না। আমার টনসিলের সমস্যা আছে— ঠাণ্ডা লাগলেই কথা বন্ধ হয়ে যায়।

পরবর্তী সময়ে আহসান যখন জিজ্ঞেস করেছে— একজন সম্পূর্ণ অচেনা একটি ছেলের সঙ্গে এতগুলো কথা তুমি ঐদিন কীভাবে বললে ? তারিন ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলেছে— জানি না কীভাবে বললাম। আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছিল তাই বলেছি। তুমি এত আন্তরিকভাবে ঐ বাচ্চাগুলোর সঙ্গে কথা বলছিলে দেখে আমার খুব মায়া লাগল। তোমার উপর মায়া পড়ে গেল।

এখন এই বুড়ো লোকটির উপর মায়া পড়ে গেছে। কলা হাতে নিয়ে কেমন জবুথবু দাঁড়িয়ে আছে। কেউ তাকে তেমন পাত্তা দিচ্ছে না। সে বোধহয় পুরো ঠিকানা নিয়ে আসে নি। আহসান এগিয়ে গেল।

আসুন, আপনার রোগী কোথায় বের করে দিচ্ছি। রোগীর নাম কী ?

মোহাম্মদ ওসমান আলি।

কী হয় আপনার ?

আমার আপন ভাইস্তা। আদমজী মিলে কাম করে।

কী কলা কিনেছেন, সব তো ছিঁড়ে-ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছে। দিন, আমার কাছে কয়েকটা দিন।

বুড়ো এই মানুষটির ভদ্রতায় অভিভূত হয়ে গেল।

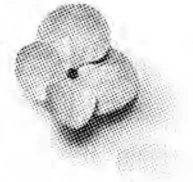

করিম সাহেবের কেবিনের নম্বর হচ্ছে এগার।

সাধারণত মরণাপন্ন রোগীর কেবিনের সামনে একটা জটলা লেগে থাকে। এখানে তা নেই। কেবিনের সামনের জায়গাটি একেবারে ফাঁকা। ভিড় দেখা যাচ্ছে ১৬ নম্বর কেবিনের সামনে। অত্যন্ত চমৎকার সব পোশাক পরা একদল মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ কাঁদছে। যারা কাঁদছে তাদের মধ্যে একজন বিদেশিনীও আছে। স্কার্ট পরা বিদেশিনী, বাঙালি মেয়েদের মতোই শব্দ করে কাঁদছে।

আহসান এগার নম্বর কেবিনের দরজায় টোকা দিতেই দরজা খুলে যে-মেয়েটি মাথা বের করল সে মহল।

আসেন। ভেতরে আসেন। আব্বা, প্রফেসর সাহেব এসেছেন।

বিছানায় সাদা চাদরে ঢাকা মানুষটি নড়ে উঠল।

কেমন আছেন করিম সাহেব ?

ভালো আছি। ভালো আছি। শুকুর আলহামদুল্লিাহ।

আহসান বড় রকমের একটা ধাক্কা খেল। বিছানায় যে পড়ে আছে সে একজন মৃত ব্যক্তি। কোনো একটি অসম্ভব অলৌকিক উপায়ে সে কথা বলছে। এরকম একটি মানুষের কথা বলতে পারার কোনো কারণ নেই।

মহল, প্রফেসর সাহেবকে বসতে দে।

আপনি কথা বলবেন না। চুপ করে থাকুন।

আপনি দেখতে এসেছেন বড় ভালো লাগছে প্রফেসর সাব। আমি এদের বলতেছিলাম প্রফেসর সাব আসবে। না এসে পারে না। মানুষ তো আমি চিনি। ব্যবসা করি, মানুষ চরাইয়া খাই। মানুষ না চিনলে চলে ?

প্লিজ কথা বলবেন না।

প্রথম বাড়ি ভাড়া নিতে যখন আসলেন আমি বেগমের মাকে বললাম— খাঁটি লোক একটা। বেগমের মা বলল, বড় বড় মেয়ে ঘরে। আমি বললাম, এ

ফেরেশতা লোক, তোমার মেয়েগুলোর দিকে কোনোদিন চোখ পড়বে না। কি কথা ঠিক হইল ?

করিম সাহেব বিজয়ীর মতো তাকালেন স্ত্রীর দিকে। বেঁটেখাট মলিন মুখের মহিলাকে ঘিরে তাঁর মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে। ভদ্রমহিলা বসে আছেন। সবচেয়ে ছোট মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়েছে। মেঝেতে জায়নামাজ বিছিয়ে বেগমের দূরসম্পর্কের ফুপু খুব নিচু গলায় কোরান শরিফ পড়ছেন।

প্রফেসর সাব।

জি বলুন।

বোধহয় বাঁচব না। আমার মাকে গত রাতে বিছানার পাশে বসে থাকতে দেখলাম। পরিষ্কার দেখলাম, কোনো ভুল নাই। মরবার আগে আত্মীয়স্বজনের রুহ দেখা যায়।

আপনি ভালো হয়ে উঠবেন, শুধু-শুধু ভয় পাচ্ছেন।

ভয় আমি পাচ্ছি না প্রফেসর সাব। মরণরে খামাখা ভয় পাব কেন বলেন ? মরণ তো আছেই। ভয় পাইতেছি অন্য জিনিসে। সেইটা আপনারে বলতে চাই।

আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন, তারপর বলবেন।

জি-না, এখনই বলতে হবে। আমার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। বড় বড় লোকসান দিয়ে শেষ হয়ে গেছি। বাজারে বিরাট দেনা। দশ-বারো লাখ টাকা দেনা। মরে গেলে মেয়েগুলোর আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। একটু দেখবেন। খোঁজ রাখবেন। দেখাশোনা করবে সেই রকম আত্মীয়স্বজন আমার কেউ নাই।

করিম সাহেব, ঐসব নিয়ে চিন্তার সময় এখনো হয় নি।

হয়েছে, সময় হয়ে গেছে। কাউরে না বললে শান্তি হবে না। আমার মেয়েগুলো বোকা, তার উপর মূর্খ। মাথার উপর কেউ না থাকলে ভেসে যাবে।

আপনি শান্ত হয়ে বিশ্রাম নিন। আমার যতদূর দেখার আমি দেখব।

করিম সাহেব চুপ করে গেলেন। চোখ বন্ধ করে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। মনে হলো তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আরো খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আহসান উঠে দাঁড়াল। লোকটির ঘুম না ভাঙিয়ে চলে যেতে হবে।

প্রফেসার সাব!

জি!

চলে যাচ্ছেন ?

ভাবলাম ঘুমিয়ে পড়েছেন।

না, ঘুমাই নাই। ঘুম হয় না। তন্দ্রার মতো হয়।

করিম সাহেব আবার কাশতে লাগলেন। দম নেবার মতো শক্তি সঞ্চয়ের পর তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা সব একটু বাইরে যাও, আমি একটা কথা প্রফেসর সাবকে বলব। দাঁড়িয়ে আছ কেন ? যাও না।

খুব অনিচ্ছার সঙ্গে সবাই বেরুল। করিম সাহেব বললেন, প্রফেসর সাব, একটু কাছে আসেন একটা কথা বলব। আহসান এগিয়ে গেল।

আমার তিন নম্বর মেয়েটা যে আছে, মহল, শুনছি তারে আপনি খুব স্নেহ করেন। দেখা হলে কথাটথা বলেন। মেয়েগুলো বোকা। পেটে কথা রাখতে পারে না। যা হয় সব তাদের মাকে বলে। তার মা বলে আমারে।

আহসান অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। করিম সাহেবের চোখ বন্ধ তবে তিনি কথা বলছেন বেশ পরিষ্কার গলায়।

বুঝলেন প্রফেসর সাব, তার মা'র কাছ থেকে শুনলাম। একদিন নাকি মহলের কাছে আচার চেয়ে খেয়েছেন। মেয়েটা সব তার মাকে বলেছে। মেয়েটাকে যদি আপনার পছন্দ হয়...। আমার মেয়েগুলো বোকা কিন্তু ভালো। মন্দ কিছু আর এদের মধ্যে নাই। আপনারে দিল থেকে কথাগুলো বললাম। দোষ হইলে মাফ কইরা দিবেন। আচ্ছা, তাহলে এখন যান।

কথা শেষ হবার আগেই নার্স এবং হাসপাতালের অ্যাটেনডেন্ট ঢুকল। করিম সাহেবকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাবে। অল্প বয়স্ক একজন ডাক্তার নার্ভাস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। আহসান তাকে একপাশে নিয়ে নিচু গলায় বলল, অবস্থা কি খুব বেশি খারাপ ?

তাই তো মনে হচ্ছে। মাথার আঘাতটা তেমন গুরুতর না, তবে লাংসে জখম আছে। অপারেশনের আগে বলা যাবে না।

সারভাইভালের সম্ভাবনা কেমন ?

বাঁচা-মরার ব্যাপারে তো স্ট্যাটিসটিকস চলে না।

আহসান নিদারুণ অস্বস্তি নিয়ে বের হলো। অপারেশনের সময় এখানে থাকা উচিত। কিন্তু থাকতে ইচ্ছে করছে না। মেয়েগুলি এমন করে কাঁদছে যে সহ্য করা মুশকিল।

হাসপাতালের গেটে দেখা হলো ড্রাইভার জলিল মিয়ার সঙ্গে। তার বগুড়া না কোথায় যেন যাবার কথা ছিল ট্রাক নিয়ে। বোধহয় যায় নি। বিরস মুখে পান চিবুচ্ছে। আহসানকে দেখে এগিয়ে এলো।

প্রবেসার সাব, সালামালিকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম।

দেখে আসছেন ?

হ্যাঁ।

ভালো করছেন। আপনার কথা খুব বলতেছিল। মরবার সময় মাথায় কিছু ঢুকলে ঐটা নিয়ে শুধু প্যাঁচাল পাড়ে। আপনার সাথে কথা বলনের শখ ছিল। শখ মিটল। আপনি কি এখন বাড়ি যান ?

হুঁ।

আসেন রিকশা করে দিই।

রিকশা করে দিতে হবে না।

চলেন যাই। আপনার সাথে একটা ছোট কথাও আছে প্রবেসার সাব।

কী কথা ?

মনে রাগ কিন্তুক নিবেন না।

না, রাগ নেব না।

কাইল রাইতে কি আপনার ঘরে একটা মেয়েছেলে ছিল ? সকালে দেখি গেইট দিয়া বাইর হয়। আমি আটকাইলাম। চোর না কী কে জানে ? শেষে বুঝলাম অন্য ব্যাপার।

আহসান সিগারেট ধরাল। জলিল মিয়া বেশ শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার তার বক্তব্য শুরু করল, করিম সাবের মেয়ে তিনটা খুব মন খারাপ করছে। মেয়ে তিনটার মন খুব নরম। আপনারে খুব মানে। হেই কারণে মনে খুব কষ্ট পাইছে। মহল মেয়েটা তো কানতেছিল।

আহসান কিছুই বলল না। জলিল মিয়া পানের পিক ফেলে বলল, এই সব ছোট কাজ করব আমার মতো মানুষ, আপনে হইলেন...।

জলিল মিয়া কথা শেষ করল না। মাঝ-পথে থেমে গেল। আহসান বলল, মহল খুব কাঁদছিল ?

জি। বয়স কম মেয়ে। দুনিয়ার হালচাল তো জানে না। এরা ভাবে এক রকম, দুনিয়া চলে অন্য রকম। প্রবেসার সাব, রিকশা নিয়া তাড়াতাড়ি যান গিয়া। আকাশের অবস্থা খারাপ।

আহসান রিকশা নিল না। হাঁটতে শুরু করল। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। জোর বৃষ্টি হবে। হোক। পৃথিবী ভাসিয়ে নিয়ে যাক। ভিজতে ইচ্ছে করছে। কী যেন সেই গানটা— 'এসো কর স্নান নবধারা জলে, এসো নীপবনে।'

জেরিন দরজা খুলল। খুশি-খুশি গলায় বলল, সত্যি তাহলে এলেন ? আমার মনে হচ্ছিল— শেষ পর্যন্ত বোধহয় আসবেন না।

বলে গিয়েছিলাম তো আসব।

তা বলে গিয়েছিলেন। পুরোপুরি বিশ্বাস করি নি। মনে হচ্ছিল পালাতে চাচ্ছেন বলে একটা অজুহাত তৈরি করেছেন।

পালাতে চাইলেও সব সময় পালানো যায় না।

ভালোই বলেছেন। যারা পালাতে চায় না তারাই শুধু পালাতে পারে। যেমন তারিন আপা। আপনার রোগী কেমন ?

ভালো না। বাঁচবে বলে মনে হচ্ছে না।

আপনাকে তার জন্যে খুব একটা দুঃখিত মনে হচ্ছে না।

দুঃখিত মনে হওয়ার কারণও নেই। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ মরছে।

খাবার দিতে বলি। হাত-মুখ ধোবেন তো ?

হ্যাঁ ধোব।

জেরিন এবং আহসান খেতে বসল। অপরিচিত একটা কাজের মেয়ে শুধু খাবার-দাবার এগিয়ে দিচ্ছে। এই বাড়িতে কোনো কাজের লোকই বেশি দিন টেকে না। জেরিন লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, বাবা শুয়ে পড়েছেন। বাবার তো সব ঘড়ি ধরা, সাড়ে দশটা বাজতেই বাতি নিভিয়ে নিদ্রা। মা'র মাথা ধরেছে। কাজেই খাবার সাজিয়ে একমাত্র আমিই আপনার জন্য জেগে আছি।

থ্যাংকস।

আপনি যা-যা পছন্দ করেন সবই জোগাড় করার চেষ্টা করেছি। নিধুর মা, তুমি চলে যাও। তোমাকে আর লাগবে না। খাওয়া শেষ হলে বলব, তখন টেবিল গোছাবে।

নিধুর মা চলে গেল। আহসানের খেতে ভালো লাগছে না। টেবিলে প্রচুর আয়োজন। প্রতিটি পদই চেখে দেখতে হবে ভেবেও বিরক্তি লাগছে।

খেতে কেমন হয়েছে ?

ভালো।

আপনি যে তরকারিতে খুব ঝাল খান তা মনে ছিল না। সব তরকারিই বোধহয় আপনার কাছে মিষ্টি-মিষ্টি লাগছে।

তুমি রেঁধেছ ?

কেন, আমি কি রাঁধতে জানি না ?

রাতদিন পড়াশোনা নিয়ে থাক, তাই বলছি।

দুলাভাই, আপনি কিন্তু কিছু খাচ্ছেন না।

শরীরটা ভালো নেই জেরিন। কিছু মুখে দিতে ইচ্ছে করছে না। তুমি খাও, আমি বসে-বসে দেখি।

জেরিন একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। মৃদু স্বরে বলল, বাবাকে আপনি চমৎকার একটা মিথ্যা কথা বললেন। শ্বশুরকে খুশি করে দিলেন।

মিথ্যা না-ও তো হতে পারে। কোনো দিন দ্বিতীয় একটি মেয়েকে বিয়ে করব না এমন প্রতিজ্ঞা ছিল না।

আমার মনে হয় আপনি বাবাকে মিথ্যা বলেছেন। আজকের রাতটা আপনার জন্য খুব একটা বিশেষ রাত। এই রাতে অন্য একটি মেয়েকে বিয়ের প্রসঙ্গ আপনি তুলতেই পারেন না। তুলেছেন কারণ আপনি বাবাকে নিশ্চিত করতে চেয়েছেন।

ঠিকই ধরেছ।

দুলাভাই, আপনার সঙ্গে আমি রূঢ় আচরণ করেছি। আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি ভালো করেই জানি ঐ চিঠি আপনার বাবা নিজে থেকেই লিখেছেন। সেখানে আপনার কোনো ভূমিকা নেই।

জানতে যখন তখন ঐ কথাগুলি বললে কেন ?

খুব রাগ হচ্ছিল বলে বলেছিলাম। রাগের সময় আমরা অনেক অন্যায় কথা বলি। বলি না ?

তা অবশ্যি বলি।

দুলাভাই, আপনি কি আমাকে খুব অপছন্দ করেন ?

অপছন্দ করব কেন ?

আমার মনে হয় করেন। আপার সঙ্গে আমার কোনো মিল নেই— এই কারণেই করেন।

আহসান হেসে ফেলল। জেরিন গম্ভীর গলায় বলল, কেউ আমাকে অপছন্দ করলে আমার খুব খারাপ লাগে। আমার সব সময় ইচ্ছা করে আমাকে সবাই ভালোবাসুক।

তোমার একার না, এরকম ইচ্ছা আমাদের সবারই করে।

আমার একটু বেশি করে। আশ্চর্য কাণ্ড কি জানেন, আমার তেইশ বছর বয়স হলো, এখনো কেউ আমাকে ভালোবাসার কথা বলে নি।

এখনো তো সময় সামনে আছে— ভবিষ্যতে বলবে।

যদি বলে তাহলে হয়তো তার মুখের উপর হেসে ফেলব।

হ্যাঁ, সেই সম্ভাবনাও আছে।

আহসান উঠে পড়ল। হাত ধুতে-ধুতে বলল, এখন বাসার দিকে রওনা হব। তুমি আমার জন্যে যে মমতা দেখিয়েছ তা আমি অনেক দিন মনে রাখব। সো নাইস অব ইউ।

জেরিন বিস্মিত হয়ে বলল, যাবেন মানে ? কোথায় যাবেন ?

বাসায় যাব। কাল ক্লাস আছে। পড়া তৈরি করব। মাস্টারদের ছাত্রদের মতো পড়া তৈরি করতে হয়।

আপনাদের পুরনো বাসরঘর এত কষ্ট করে সাজিয়ে রাখলাম, আর আপনি চলে যাবেন ?

ঐসব ছেলেমানুষির বয়স কি এখন আছে ? গল্প-উপন্যাসে এ-সব মানায়। শূন্য বাসরঘরে নায়ক ঢুকবে— পুরনো স্মৃতি মনে পড়বে। সবই আছে শুধু সে নেই। বালিশের পাশে বাসি ফুলের মালা। বিছানায় স্মৃতিময় চুলের কাঁটা।

দুলাভাই, আপনি কিন্তু যেতে পারবেন না। আপনি চলে গেলে আমার খারাপ লাগবে। খুবই খারাপ লাগবে।

খারাপ লাগবে কেন ?

দুপুরে আপনার সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার করেছি। এই জন্যেই খারাপ লাগবে।

এ-সব নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না জেরিন।

আমি জানি আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন না। কারণ আমাকে আপনি খুবই তুচ্ছ জ্ঞান করেন। আমি একটা মন্দ কথা বললেও আপনার কিছু যায়-আসে না।

এক জিনিস নিয়ে তর্ক করতে ভালো লাগছে না। ঠিক আছে তুমি খুবই তুচ্ছ। দয়া করে এক কাপ চা দাও। খেয়ে চলে যাব। ঝড়-বৃষ্টি হবে।

জেরিন গম্ভীর মুখে চা বানিয়ে আনল। এবং খুবই হালকা গলায় বলল, আপনি আপনার বাড়িওয়ালার যে মেয়েটিকে বিয়ে করবেন বলে ঠিক করেছিলেন— তার নাম কি মহল?

আহসান চমকে উঠে বলল, ওদের নাম জানো তুমি?

হ্যাঁ জানি।

কী করে জানো?

আপনার খোঁজে একবার গিয়েছিলাম। তখন আলাপ হয়েছে।

কই আমি তো কিছু জানি না। ওরা তো আমাকে কিছু বলে নি। অবশ্যি এমনিতেও ওদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয় না। মেয়েগুলো খুব লাজুক।

লাজুক কিনা জানি না, তবে মাথায় ছিট আছে। একদিন নিউমার্কেটে ওদের সঙ্গে দেখা। তিন বোন একসঙ্গে ওজনের যন্ত্রে দাঁড়িয়ে ওজন নিচ্ছে। তিনজন একসঙ্গে ওজন নেবার পেছনে যুক্তিটা কী বলুন তো?

আহসান শব্দ করে হেসে উঠল। জেরিন বলল, আপনি কি জানেন এই মেয়ে তিনটি আপনাকে খুব পছন্দ করে? বিশেষ করে মহল মেয়েটি।

কী করে বুঝলে?

ওর বড় দু'বোন আমার সামনেই এ-সব নিয়ে মহলকে ক্ষেপাতে লাগল। শেষে সেই মেয়ে কেঁদে-টেদে অস্থির। আচ্ছা দুলাভাই, আপার সঙ্গে কি মহল মেয়েটির কোনো মিল আছে?

না, কোনোই মিল নেই।

তাহলে ঐ মেয়েটিকে এত পছন্দ করেন আর আমাকে এত অপছন্দ করেন কেন? আমার সঙ্গে তো আপার খুব মিল আছে। ভালো করে দেখুন, আমি কি দেখতে অবিকল আপার মতো না?

না।

আপার মতো হলে বোধহয় এখানে থেকে যেতে রাজি হতেন?

বোধহয়। উঠি জেরিন। তুমি কি আমাকে একটা ছাতা এনে দিতে পার?

মনে হয় পারি।

জেরিন ছাতা এনে দিল। অস্বাভাবিক কোমল স্বরে বলল, দুপুরের ঘটনার জন্যে আমি খুবই লজ্জিত। কিছু মনে করবেন না।

আমি কিছুই মনে করি নি।

যাবার আগে শুধু একটা কথা বলে যান— আপার কোন জিনিসটা আপনার কাছে খারাপ লাগত। আগেও প্রশ্ন করেছিলাম, জবাব দেন নি।

তোমার আপার সঙ্গে মাত্র তের মাস একসঙ্গে কাটিয়েছি। প্রচণ্ড একটা সুখের মধ্যে সময় কেটে গেছে। খারাপ কিছু চোখে পড়বে কীভাবে?

আপা খুব ভাগ্যবতী।

বিয়ের তের মাসের মাথায় মরে গেল এই জন্যে?

হ্যাঁ। আমিও ঠিক করে রেখেছি বিয়ের তিন মাসের মাথায় বিষ খেয়ে মরে যাব।

একবার তো শুনেছিলাম সারা জীবন বিয়ে করবে না। মত পাল্টেছ?

না। কথার কথা বলছি। ঠাট্টা করছি।

জেরিন গেট পর্যন্ত এলো। ক্লান্ত গলায় বলল, অনেকক্ষণ বক-বক করেছি, কিছু মনে করবেন না। দুপুরবেলার ঘটনার জন্য আমি লজ্জিত।

কী মুশকিল, এককথা ক'বার বলবে?

ঠিক আছে আর বলব না।

জেরিন একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। কেন ফেলল আহসান বুঝতে পারল না। খুব জটিল ব্যাপার আমরা অনেক সময় চট করে বুঝে ফেলি, আবার খুব সহজ জিনিস বুঝতে পারি না।

রিকশাওয়ালা রোগা।

কিন্তু রিকশা চালাচ্ছে ঝড়ের বেগে। বৃষ্টি নামবার আগেই বাড়ি ফেরার ইচ্ছে। কিংবা রিকশা জমা দেবার সময় পার হয়ে যাচ্ছে। আহসান বলল, রিকশা কোন জায়গার ?

মিরপুর।

থাক কোথায় ? মিরপুর ?

হুঁ। মিরপুর এক নম্বর।

ছেলে-মেয়ে আছে ?

হুঁ।

ক'জন ?

রিকশাওয়ালা জবাব দিল না। আহসান লক্ষ করেছে কোনো রিকশাওয়ালাই ব্যক্তিগত প্রশ্নের জবাব দিতে আগ্রহ বোধ করে না, বরং বিরক্ত হয়। এই রিকশাওয়ালাটি যেমন হচ্ছে।

রিকশায় উঠে লম্বা আলাপ জুড়ে দেবার স্বভাবও আহসানের নয়। এই বদ অভ্যাসটি তারিনের। অচেনা, অজানা যে-কোনো মানুষের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেবে। একদিন আহসান বলেই বসল, কী বিশ্রী স্বভাব! অচেনা একজন মানুষের সঙ্গে কী আলাপ শুরু করলে ? এটা খুবই বদ অভ্যাস। তারিন হাসতে হাসতে বলেছে, বদ অভ্যাসটা ছিল বলেই তোমার সঙ্গে পরিচয় হলো। নয়তো তোমার সঙ্গে পরিচয় হতো না। কি ঠিক বলছি না ?

তাই বলে রিকশাওয়ালাদের সঙ্গে আলাপ জুড়বে ?

আলাপ কোথায় ? দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করি।

জিজ্ঞেস করে তো ঝামেলার সৃষ্টি কর।

না-হয় হলোই খানিকটা ঝামেলা।

খানিকটা না, মাঝে-মাঝে বেশ বড় রকমের ঝামেলা হয়। একজন বলে বসল তার মেয়ের বিয়ে। সবকিছু যোগাড় হয়েছে শুধু জামাইয়ের জন্যে পাঞ্জাবি যোগাড় হয় নি। এখন যদি পাঞ্জাবির দামটা দেন। সবটা দিতে হবে না। তিরিশ টাকা তার কাছে আছে। তারিন বলল, আর কত টাকা হলে পাঞ্জাবি হয় ?

পঞ্চাশ টেকা আম্মা। পঞ্চাশ হইলেই হয়।

আহসান এই সময়ে ইংরেজিতে বলল, একটা কথাও বিশ্বাস করবে না। ডাহা মিথ্যা কথা বলছে।

সত্যিও তো হতে পারে। বেনিফিট অব ডাউট বলে একটা কথা আছে।

ওটা হচ্ছে আদালতের কথা। এটা আদালত না।

আদালত না হলেও আমার মনে হয় লোকটা সত্যি বলেছে।

আমি এক হাজার টাকা বাজি রাখতে পারি— লোকটা মিথ্যা কথা বলছে।

তারিন কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বলেছে, এক কাজ করলে কেমন হয় ? চল রিকশাওয়ালাকে বলি আমাদের তার বাড়িতে নিয়ে যেতে। সরেজমিন গিয়ে দেখা যাক সত্যি-সত্যি তার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে কিনা।

তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি ?

পাগলের কী আছে ! একটা অ্যাডভেঞ্চার।

অসম্ভব। তার চেয়ে তুমি ওকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দাও। ঝামেলা চুকে যাক।

না না, চল ওর বাসায় যাই।

ইংরেজি কথাবার্তা বন্ধ করে তারিন এবার পরিষ্কার বাংলায় বলল, এই রিকশা, চল তোমার বাড়ি যাব। দেখব তোমার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে কি-না।

রিকশাওয়ালা অবাক হয়ে রিকশা থামাল। নিচু গলায় বলল, সত্যি যাইবেন ?

হ্যাঁ, কোথায় তোমার বাসা ?

সোবানবাগ।

চল সোবহানবাগে।

সত্যি যাইবেন ?

হ্যাঁ, যাব।

আহসান বলল, ফর গডস শেক, এখন আমরা একটা কাজে যাচ্ছি তারিন।

তেমন কোনো জরুরি কাজ না। ঘণ্টাখানেক পরে গেলেও ক্ষতি হবে না। এই রিকশা চল।

রিকশাওয়ালা গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মুছতে লাগল। আহসান বলল, এই দেখ সে যেতে চাচ্ছে না। তার মানে পুরো ব্যাপারটাই বানানো। ও বিয়েই করে নি— ওর মেয়ে আসবে কোত্থেকে।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার বিয়ে সত্যি-সত্যি হচ্ছিল। তের-চৌদ্দ বছরের একটা মেয়ে সেজেগুজে বসে আছে। কাগজের চেইন দিয়ে ঘর সাজানো। দু'টি কলাগাছ পুঁতে গেট।

শুধু পাঞ্জাবির টাকা নয়, মেয়েটির জন্যে একটি শাড়ি, মাইক ভাড়া করবার জন্যে দু'শ টাকা দিয়ে তারিন ঘোষণা করল বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত সে এখানে থাকবে। আহসান রাগী গলায় বলল, তার কোনো দরকার আছে ?

আছে। এই লোকটিকে আমি অন্যায়ভাবে সন্দেহ করেছি। আমার খুব খারাপ লাগছে। তাছাড়া বেচারা তার মেয়ের বিয়ের দিনও রিকশা চালাচ্ছে, আমার মনটা ভেঙে গেছে। আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে। তুমি বুঝতে পারবে না। ছোটখাট জিনিস আমাকে খুব কষ্ট দেয়।

সত্যি-সত্যি তুমি থাকবে ?

হ্যাঁ থাকব। তুমি এক কাজ কর না কেন ? তুমি চলে যাও।

আহসান যেতে পারে নি। সে থেকে গেল এবং অবাক হয়ে লক্ষ করল মেয়ে বিদায়ের সময় যখন চারদিকে কান্নাকাটির মাতম উঠল তখন তারিন আড়ালে সরে গেল, কারণ তার চোখ দিয়ে ক্রমাগত পানি পড়ছে। সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে যেন কেউ দেখে না ফেলে।

অনেকদিন পর ঐ রিকশাওয়ালাটির সঙ্গে আহসানের দেখা হয়েছিল। আহসান চিনতে পারে নি। লোকটির চেহারা বদলে গেছে। দাড়ি রেখেছে। শরীর হয়েছে আরো দুর্বল। রিকশা এখন প্রায় টানতেই পারে না। সে ক্লান্ত গলায় বলল, স্যার, ভালো আছেন ? আমারে চিনছেন ?

না।

আমার মাইয়ার বিয়া দিলেন আপনারা।

ও আচ্ছা! তোমার মেয়ে ভালো আছে ?

জি-না। মাইয়াটা মারা গেছে।

আহসান চুপ করে গেল। রিকশাওয়ালা বলল, আম্মা কেমন আছেন ?

আমার স্ত্রীর কথা বলছ ? সেও মারা গেছে। বাচ্চা হতে গিয়ে মারা গেছে। বেশিদিন হয় নি। মাস ছয় হলো।

রিকশাওয়ালা রাস্তার পাশে রিকশা থামাল। তারপর সমস্ত পথচারীদের সচকিত করে হাউ-মাউ করে কাঁদতে শুরু করল। এই তীব্র আবেগের ভগ্নাংশ হয়তো তারিনের জন্যে, বাকি সবটা তার কন্যার শোক।

তারিনের মৃত্যুর পর একবারও আহসান কাঁদে নি। চোখ ভিজে উঠে নি কখনো। মানুষ বড় আশ্চর্য প্রাণী। তারিনের কথা আজকাল মনেও পড়ে না। চোখ বন্ধ করে চেহারা মনে করতে চাইলেও লাভ হয় না। চেহারা মনে পড়ে না। ফরসা, রোগা, লম্বা একটি মেয়ে যে বেশিরভাগ সময়ই চুল ছাড়া রাখে এবং সেই চুলে দু'চোখের খানিকটা ঢাকা পড়ে থাকে তার সত্যিকার চেহারাটা কেমন ? ছবির সঙ্গেও তার চেহারাটা ঠিক মিলানো যায় না। সব সময় মনে হয় তারিন অন্যরকম ছিল। ছবিতে চেহারা আসে নি।

হাসপাতালে যাবার আগে হঠাৎ একদিন বলল, কেন জানি মনে হচ্ছে হাসপাতাল থেকে আর ফিরে আসব না। ইট ইজ এ ওয়ান ওয়ে জার্নি।

আহসান হাসতে হাসতে বলেছে, প্রতিটি প্রেগনেন্ট মেয়ে যখন হাসপাতালে যায় তখন তার এই কথা মনে হয়। সে ঠিকই ফিরে আসে।

ধর যদি না আসি তখন কী হবে ?

কী হবে বলতে কী মিন করছ ?

তোমার খুব নিঃসঙ্গ লাগবে না ?

লাগারই তো কথা।

বিয়ে তো করবেই। করবে না ?

এখন কী করে বলি ? সময় আসুক।

বিপত্নীক মানুষ খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে করে। ওরা নিঃসঙ্গ বোধ করে, সেই জন্যেই করে। এতে ওদের কোনো দোষ নেই।

আমি বিয়ে করলে তোমার আপত্তি হবে না ?

তারিন সহজ স্বরে বলল, না। আপত্তি হবে কেন ? তবে একটা কথা বলি মন দিয়ে শোন। তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। কিছুদিন অপেক্ষা করবে।

কীসের জন্যে অপেক্ষা ?

মনে কর চট করে তুমি বিয়ে করে ফেললে। নতুন একটি মেয়ে এলো অথচ তখনো আমার কথা তোমার পুরোপুরি মনে আছে। তুমি সারাক্ষণ আমার সঙ্গে মেয়েটির তুলনা করবে। নিজে কষ্ট পাবে, মেয়েটিকেও কষ্ট দেবে। কাজেই তোমার উচিত হবে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করা।

আহসান হাসতে হাসতে বলল, কত দিন ?

তুমি চোখ বন্ধ করে আমার মুখ কল্পনা করার চেষ্টা করবে। যেদিন দেখবে আর কল্পনা করতে পারছ না সেদিন তোমার মুক্তি।

তারিনের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পর আহসান তার মুখ কল্পনা করতে চেষ্টা করল। পারল না। অসহ্য কষ্টে সারা রাত জেগে রইল। মানুষ বড় বিচিত্র প্রাণী। তারিন শুধু নিজেই চলে যায় নি, সবকিছু সঙ্গে নিয়ে গেছে। এমন করল কেন সে ?

তারিন মারা গিয়েছিল রক্তক্ষরণজনিত কারণে। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান রক্তপাত বন্ধের জন্যে কিছুই করতে পারল না। তিনদিনে সাতবার রক্ত দেওয়া হলো। অষ্টমবারের বার তারিন বলল, আর না। বাদ দিন। আমার ছেলেকে আমার পাশে শুইয়ে দিন। আর ছেলের বাবাকে একটু আসতে বলুন।

আহসান পাশে এসে বসল। তারিন মৃদু গলায় বলল, কী হচ্ছে বুঝতে পারছ ?

কিছু হচ্ছে না। তুমি সুস্থ হয়ে বাসায় যাবে।

যেতে পারলে মন্দ হতো না। তুমি এখন আর আমার সামনে থেকে নড়বে না। হাত ধরে বসে থাক। লজ্জা লাগছে না তো আবার ?

না, লজ্জা লাগছে না।

তারিন ফিসফিস করে বলল, Since there is no help come let us kiss and say good bye.

কী-সব আজেবাজে কথা বলছ ?

ঠাট্টা করছি। মরতে বসেছি বলে কি ঠাট্টাও করতে পারব না ? তোমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছি।

তারিন সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের মতো খিলখিল করে হেসে উঠল। সতেজ প্রাণময় হাসি। সে মারা গেল তার মাত্র চার ঘণ্টা পর। মৃত্যুর সময় তার জ্ঞান ছিল না। থাকলে হয়তো তখনো মজার কিছু বলার চেষ্টা করত। বেঁচে থাকাটা তার জন্যে খুব সুখের ব্যাপার ছিল বলেই বোধহয় সে বেঁচে থাকতে পারল না।

রিকশা আদাবর পর্যন্ত ঠিক করা কিন্তু আহসান শ্যামলীতে নেমে পড়ল। সাত টাকা ভাড়া ঠিক করা ছিল, সে দিল দশ টাকা। কোমল স্বরে বলল, ভাঙতি ফেরত দিতে হবে না। রিকশাওয়ালা অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। আহসান বলল, বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে।

জি স্যার।

তোমার রিকশার জমার টাইম হয়ে গেছে বোধহয়।

জি স্যার।

যাও তাহলে আর দেরি করবে না। দেরি করলে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে পড়ে যাবে।

রিকশাওয়ালা থেমে থেমে বলল, আপনে আমার ছেলেপুলে কয়জন জিগাইছিলেন— আমার দুই পুলা।

ভালো, খুব ভালো।

বড় পুলারে ইস্কুলে দিছি।

খুব ভালো করেছ।

তাইলে স্যার যাই। স্লামালিকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম।

রিকশাওয়ালা চলে যেতেই আহসানের ইচ্ছা করল রেবা বা পারুল নামের ঐ মেয়েটিকে খুঁজে বের করতে। যে মেয়েটি দেখতে তারিনের মতো। তাকে কিছু টাকা-পয়সা দিতে ইচ্ছা করছে। আজকের রাতে সে যেন নিজের ঘরে গিয়ে আরাম করে ঘুমোতে পারে। আজ যেন কেউ তাকে বিরক্ত না করে। হয়তো এই মেয়েটির ঘরে পঙ্গু স্বামী আছে, শিশুপুত্র আছে। আজ রাতটি সে তার স্বামীর পাশে শুয়ে থাকুক। একটি হাত রাখুক স্বামীর গায়ে।

আহসান এগিয়ে গেল সিগারেটের দোকানের দিকে। এরা গভীর রাত পর্যন্ত ছোট দোকান সাজিয়ে বসে থাকে। নিশিকন্যাদের খবর এরাই সবচেয়ে ভালো জানবে।

একটা রোগামতো ফরসা মেয়ে। বাজে টাইপের মেয়ে। এদিকেই থাকে। তুমি দেখেছ তাকে ? রেবা কিংবা পারুল নাম।

দোকানদার রাগী চোখে তাকিয়ে রইল।

আহসান বলল, তুমি তাকে দেখ নি কোনো দিন ?

দেখছি। দেখুম না কেন ? আল্লায় চউখ দিছে দেখনের লাগি।

আজ দেখেছ ?

না। তয় বাসস্ট্যান্ডের কাছে গিয়ে দেখেন। রাইত বেশি হইলে ঐখানে দাঁড়াইয়া কাস্টমার খুঁজে।

রেবা বা পারুল নামের মেয়েটিকে পাওয়া গেল। পুরোপুরি নির্জন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। আজ তার হাতে চটের একটা ব্যাগ। আহসানকে দেখে সে একটুও চমকাল না বা অবাক হলো না। বিস্মিত হবার ক্ষমতা সম্ভবত এ-জাতীয় মেয়েদের নষ্ট হয়ে যায়। পৃথিবীর কোনো কিছুই তাদেরকে আর অভিভূত করতে পারে না।

কেমন আছ পারুল ?

মেয়েটি জবাব দিল না। চোখ বড়-বড় করে তাকাল।

অন্য স্যান্ডেলটি খুঁজে পেয়েছিলে ?

না।

এসো আমার সঙ্গে। আমি দেখেছি কোথায় আছে।

পারুল নিঃশব্দে এগিয়ে এলো।

তোমার হাতে ব্যাগ কেন ? ব্যাগে কী আছে ?

সদাই।

ঐ দিন কিছু না বলে চলে গেলে। আমি তোমাকে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলাম।

খামাখা টেকা দিবেন কেন ?

খামাখা নয়। কারণ আছে।

আহসান আশা করছিল মেয়েটি বলবে— কী কারণ ? কিন্তু সে বলল না। নিঃশব্দে পেছনে-পেছনে আসতে লাগল।

ঐ যে দেখ তোমার স্যান্ডেল।

মেয়েটি গভীর মমতায় স্যান্ডেলটি তুলল। আহসান অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল, তুমি কি এখানে ফুলের গন্ধ পাচ্ছ ? এই জায়গাটার একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। মাঝে-মাঝে ফুলের গন্ধ পাওয়া যায় অথচ আশেপাশে কোনো ফুলের গাছ নেই।

ফুলের গন্ধ না। আগরবাতির গন্ধ।

আগরবাতির গন্ধ ?

হুঁ। পীর সাবের একটা মাজার আছে দোকানের পিছনে। এরা আগরবাত্তি জ্বালায়।

ও আচ্ছ! হ্যাঁ তাই। এখন মনে হচ্ছে আগরবাতিরই গন্ধ। এই জিনিসটি নিয়ে আমি অনেকদিন ভেবেছি বুঝলে ? কারণটা বের করতে পারি নি।

মেয়েটি হাসছে। সরল সহজ হাসি। পৃথিবীর কোনো মালিন্য সেই হাসিকে স্পর্শ করে নি।

পারুল!

জি।

এসো আমার সঙ্গে।

মেয়েটি ছোট-ছোট পা ফেলতে লাগল। আহসান বলল, তোমার যখন টাকা-পয়সার দরকার হবে আসবে আমার কাছে, কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে না। আমার স্ত্রীর চেহারার সঙ্গে তোমার খুব মিল আছে, এই জন্যেই একথা বলছি।

কতদিন আপনে আর আমারে টেকা দিবেন ? আমার দুইটা মাইয়া আছে। না খাইয়া সারা দিন বইসা থাকে। দুনিয়াডা খুব খারাপ জায়গা ভাইজান।

হ্যাঁ, খুবই খারাপ। দ্য উইন্টার অব ডিসকনটেন্ট।

পারুল দাঁড়িয়ে পড়ল। শান্তস্বরে বলল, আপনের কাছ থাইক্যা টেকা নিতাম না।

কেন ?

ঝড় বৃষ্টি আইতাছে, ঘরে যামু।

হেঁটে হেঁটে যাবে ?

জি।

চল তোমাকে খানিকটা এগিয়ে দিই।

না। আপনে ঘরে যান।

মেয়েটি ঘুরে দাঁড়াল। পরক্ষণেই দ্রুত পা ফেলতে লাগল।

বাতাস বইতে শুরু করেছে। শিগগিরই বৃষ্টি নামবে। মেয়েটি কি পারবে বৃষ্টির আগে আগে ফিরে যেতে ? হয়তো পারবে, হয়তো পারবে না।

করিম সাহেবের বাড়ির সবগুলো আলো জ্বলছে, কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে দূর থেকে। আজ এদের খুব দুঃখের রাত।

আহসান নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। বারান্দায় জলিল মিয়া এবং তার হেলপার উবু হয়ে বসেছিল। তারা তাকাল কিন্তু কিছু বলল না।

ঝড় বৃষ্টি শুরু হলো রাত বারোটার দিকে। ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়ে চারদিকে নিকষ অন্ধকার। আহসান মোমবাতি জ্বালিয়েছে। বাতাসের ঝাপটায় মোমবাতি নিবু-নিবু হয়েও আবার জ্বলে উঠছে। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে কান্নার শব্দ মিলে গিয়ে কী যে অদ্ভুত শোনাচ্ছে!

এই রাতটির সঙ্গে তার বিয়ের রাতের বড় অদ্ভুত মিল তো! বিয়ের রাতেও ঠিক এই ব্যাপার। তাদের বাসর দোতলায়। হঠাৎ করে ঠিক করা। ফুলটুল কিছুই জোগাড় হয় নি। পুরনো আমলের বিশাল পালঙ্কে বড়-বড় ফুল আঁকা একটা চাদর শুধু বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানালার একটা কাচ ভাঙা। কাচের ভেতর দিয়ে বারবার পানির ঝাপটা আসছে। ইলেকট্রিসিটি নেই। দু'টি মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে। অনেক রাতে হাতে একটা হারিকেন নিয়ে তারিন ঢুকল। আহসান বলল, বাসর রাতে হারিকেন ? ভারি কুৎসিত ব্যাপার! ওটা বাইরে রেখে আস।

হুঁ, তারপর অন্ধকারে ভূতের ভয়ে কাঁপি। হারিকেন থাকবে। ইস, পালঙ্ক তো ভিজে জবজবে। এসো না ধরাধরি করে পালঙ্কটা সরাই।

দু'জনে বহু ঠেলাঠেলি করেও সেই গন্ধমাদন পর্বত একচুল সরাতে পারল না। তারিন বলল, নিচ থেকে দু' একজনকে ডেকে আনব ? আহসান বলল, থাক ডাকতে হবে না।

তারিন খুব খুশি। হাসিমুখে বলল, গল্প করেই রাতটা কাটিয়ে দিই, কি বলো ? বলো তুমি একটি গল্প, তারপর আমি বলব। এইভাবে চলবে সারা রাত।

নাকি আমি শুরু করব— এক ছিল টোনা আর এক ছিল টুনি। টোনা কহিল, টুনি পিঠা তৈরি কর।

তারিন গল্প বলছে আর হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে। আহসান বলল, বাসর রাতে এত হাসতে নেই।

কেন ? হাসতে নেই কেন ?

বাসর রাতে হাসা খুব অলক্ষণ।

বলেছে তোমাকে!

সত্যি অলক্ষণ। বেহুলা বাসর রাতে খুব হাসাহাসি করছিল, তার ফলে লখিন্দর বেচারার কী অবস্থা হলো দেখলে না ?

সত্যি বেহুলা হাসাহাসি করছিল ? নাকি তুমি বানিয়ে বানিয়ে বলছ ?

সত্যি হাসছিল।

বেশ, তাহলে আর হাসব না।

তারিন চুপ করে গেল। আর ঠিক তখনি নিচ থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসল। মেয়েলি গলায় কান্না। আহসান চমকে উঠে বলল, কে কাঁদছে ?

আমার দাদি। উনার মাথার ঠিক নেই। রাত-বিরেতে উনি এরকম কাঁদেন।

বলো কী!

সব সময় না, মাঝে-মাঝে।

সারা রাতই কি কাঁদবেন ?

হ্যাঁ কাঁদবেন। বুড়ো মানুষদের কত রকম কষ্ট।

বলতে বলতে তারিনের চোখে পানি এসে গেল। আহসান বলল, বাসর রাতে কাঁদতেও নেই। কাঁদাও অলক্ষণ। তারিন আঁচলে চোখ মুছে সঙ্গে সঙ্গে হাসল।

ঐ রাতের সঙ্গে আজকের রাতের কী অদ্ভুত মিল! আজও ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। নিচ থেকে কান্নার শব্দ আসছে। মোমবাতি জ্বলছে ঘরে। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার এ-ঘরেও জানালার একটি কাচ ভাঙা। প্রচুর বৃষ্টির পানি ঢুকছে। আহসান চোখ বন্ধ করে তারিনের মুখ মনে করতে চেষ্টা করল— পারল না।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। ছোট ছোট পা ফেলে কে যেন আসছে। কে হতে পারে ? থমকে দাঁড়াল দরজার পাশে। আহসান বলল, কে ? কেউ জবাব দিল না। সে উঠে এসে দরজা খুলে দিল। মহল হারিকেন হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তার এক হাতে একটা থালায় কয়েকটা মিষ্টি। সে মিষ্টির থালাটা নিঃশব্দে আহসানের

সামনে নামিয়ে রাখল। মৃদু স্বরে প্রায় ফিস-ফিস করে বলল, আব্বাজানের অপারেশন খুব ভালো হয়েছে। ডাক্তাররা বলেছে ভয়ের আর কিছু নেই। মিলাদের মিষ্টি। একটু খান।

আহসান অবাক হয়ে বলল, এ তো বিরাট আনন্দের খবর। সবাই কাঁদছে কেন ?

খুশিতে কাঁদতেছে। খুশির কাঁদা।

মহল তুমি বসো, একটু বসো। আমি নিজেও অসম্ভব খুশি হয়েছি। বসো তুমি, একটু বসো।

মহল অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। যেন আহসানের কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। সে ভয়ে ভয়ে চেয়ারে বসল। আহসান সহজ স্বরে বলল, তোমাকে আমি খুব একটা জরুরি কথা বলতে চাই মহল। আজ না বললেও চলত, তবু আজই বলতে চাই। কথাটা বলার জন্যে আজ রাতের মতো চমৎকার একটা রাত আর আসবে না। কথাটা হচ্ছে...।

আহসান একটু থামল। মহল চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। তার চোখে শঙ্কার ছায়া। তার হাতের হারিকেন কাঁপছে। বিচিত্র সব নক্‌শা তৈরি হচ্ছে দেয়ালে। আহসান শান্ত স্বরে বলল, তোমার বাবা যখন সুস্থ হয়ে বাসায় আসবেন তখন তাঁকে আমি একটা অনুরোধ করতে চাই। তাঁকে বলতে চাই যে আপনার তিন নম্বর মেয়েটিকে আমি বিয়ে করতে চাই। যদি আপনি রাজি হন তাহলে আমার আনন্দের সীমা থাকবে না।

মহল এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, চোখে পলক পর্যন্ত পড়ছে না। আহসান হাসি-হাসি মুখে বলল, তোমারও রাজি হওয়া না হওয়ার একটা প্রশ্ন আছে, তাই না ? তুমি যদি রাজি থাক তাহলে আমার জন্যে খুব চমৎকার এক কাপ চা বানিয়ে নিয়ে এসো। খুব চায়ের তৃষ্ণা হচ্ছে।

অনেকক্ষণ কেটে গেছে মহল আসছে না। বাইরে তুমুল বর্ষণ হচ্ছে। আহসান যখন প্রায় নিশ্চিত যে মহল আসবে না তখনই চুড়ির শব্দ পাওয়া গেল। চায়ের কাপ হাতে মহল ঢুকল মাথা নিচু করে। সে এর মধ্যে কাপড় বদলে সুন্দর একটা শাড়ি পরেছে। চুল বেঁধে চোখে কাজল দিয়েছে। হাত-ভর্তি লাল কাচের চুড়ি। আহসান হাসি মুখে বলল, মহল, তোমাকে ভারি সুন্দর লাগছে।

মহলের মাথা আরো নিচু হয়ে গেল। দরজার ওপাশে চাপা হাসি। চুড়ির শব্দ। আহসান বাইরে উঁকি দিল। দরজার ওপাশে বড় দু'বোনও দাঁড়িয়ে আছে। ওরাও অবিকল মহলের মতো শাড়ি পরেছে। চোখে কাজল দিয়েছে, চুল

বেঁধেছে। সবার হাত ভর্তি লাল চুড়ি। আহসান উঁকি দিতেই ওরা শব্দ করে ছুটে পালাল। মহল মাথা নিচু করে আছে। কী ভাবছে মনে-মনে কে জানে।

মহল!

জি।

একটা গল্প বলো।

মহল বিস্মিত হয়ে তাকাচ্ছে।

গল্প জানো না ?

মহল তার উত্তর দিল না। মুখ ঘুরিয়ে দেয়ালের দিকে তাকাল। সেখানে তারিনের ছবি। সে যেন হাসি-হাসি মুখে দেখছে এদের দু'জনকে।

মহল!

জি।

এই লাইনটির মানে জানো ? ...Since there is no help come let us kiss and part.

মহল উত্তর দিল না। আহসান কোমল গলায় বলল, ঐ লাইনটির মানে তোমার জানার প্রয়োজন নেই।